লহরী।

কতিপয় স্ত্রী-পাঠ্য গল্পের সমষ্টি।

হাওড়া—"আলোচনা সমিতি" হইতে—

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীঅমৃত লাল কুণ্ডু।

প্রথম প্রচারণ।

মূল্য ৷৹ আনা।

PRINTED BY

NAFAR CHANDRA DUTTA,

AT

THE SALKIA PRINTING WORKS,

Kaldanga Lane, Salkia,

HOWRAH.

উৎসর্গ পত্র।

মহামহিমার্ণবোপম, স্বদেশ-হিতৈষী, দীনজন প্রতিপালক

কাকিনাধিপতি

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুর

প্রবল প্রতাপেষু।—

রাজন্!

আপনি চিরকাল সাহিত্য-সেবীগণকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি-সাধন-কল্পে দুস্থ সাহিত্য-সেবীগণকে আপনি যেরূপ অকাতরে দান করিয়া থাকেন, অধুনা বঙ্গদেশে আর কোন রাজাই তাদৃশ করেন না,—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল বিষয়ে উৎসাহ দান করিতে আপনি যে একজন আদর্শ মহাপুরুষ—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আমাদের "আলোচনা" পত্রিকাকে আপনি স্নেহের চক্ষে দেখেন— তাই আজ "আলোচনা সমিতি" হইতে লিখিত মৎপ্রণীত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনার কর-কমলে অর্পণ করিয়া লেখনী ধারণ সার্থক করিলাম। অধীরাজ! দীনের এই দীন উপহারে আপনি সামান্য মাত্র সন্তোষ লাভ করিলেও পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি—

হাওড়া,
আলোচনা সমিতি,
৮ই শ্রাবণ, ১৩১৩। } গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

—(*)—

——*——

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

কর্ম্মফল ।

কর্ম্মফল।

(১)

কুলীনের পক্ষে কন্যাদায় ভয়ানক ব্যাপার; কুলীনের কন্যা হইলে তাহার অবস্থার ব্যবস্থা থাকে না; এই দায়ে পতিত হইলে তাহাদের যে কি কষ্ট, কি মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়, তাহা আধুনিক সভ্যসমাজে সকলেই বিদিত আছেন।

মনোহর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা চারুশীলা বড় হইয়াছে,—যেঠের কোলে দশ উত্তীর্ণ হইয়া একাদশে পদার্পণ করিয়াছে, আর বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না, এখনও অবিবাহিত রাখায় লোকে কত কথা বলিতেছে—কত কাণাকাণি করিতেছে, হয় ত তাহাকে লোকে কত পরিহাসও করিতেছে। চারুশীলার পিতা মনোহর বাবুর এই চিন্তাই এখন ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যতই দিন যাইতে লাগিল, মনোহরের চিন্তাস্রোতও ততই প্রবল হইতে লাগিল।

মনোহরের আয় অতি সামান্য—মাসিক ৩০৲ টাকা মাত্র। বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী, একটী পুত্র ও চারুশীলা নাম্নী এক কন্যারত্ন ভিন্ন এ সংসারে তাঁহার আর কেহ আপনার বলিতে ছিল না। এই সামান্য আয়ে সংসার খরচই এক প্রকার বহুকষ্টে সঙ্কুলান হয়; তাহার উপর বিবাহের জন্য হাজার বারশত টাকা সংগ্রহ

হইবে কেমন করিয়া! ঐ টাকা না হইলে ত আর বিবাহ হইবে না; আর তাহার পক্ষে ঐ টাকা সংগ্রহ করাও এক প্রকার দুরূহ ব্যাপার।

মনোহর বাবু কলিকাতার কোন সওদাগরী আপিসে কেরাণীগিরি চাকরী করেন। তিনি অতি ধর্ম্মভীরু, অমায়িক প্রকৃতির লোক; কাজেই মাসিক ৩০৲ টাকা ভিন্ন আর তাঁহার অন্য আয় নাই। কেমন করিয়া কি হইবে; কেমন করিয়া কন্যার বিবাহ দিবেন; মনোহর চিন্তা করিয়াও তাহার কিছুই কুলকিনারা করিতে পারেন না। অথচ যখন অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা ঘরে রাখিয়াছে, তখন চিন্তা না করিয়াই বা কি করেন, তবুও গৃহিণী শিবানী মনোহরকে দিন দিন এতাদৃশ চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া কত বুঝাইতেন। মনোহরের যেমন যে প্রস্ফুটিত কুসুমকান্তিবিশিষ্ট মনোহর বরবপু, চিন্তাকীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে যেন শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখিয়া কোন্ সাধ্বী সতী নীরবে থাকিতে পারেন? এইজন্য শিবানীও স্বামীর ভাবগতিক দেখিয়া একান্ত ম্রিয়মাণা হইতে লাগিলেন। স্বামীই যে স্ত্রীর একমাত্র গতি, কায়ার ছায়া। কায়া বিচঞ্চল হইলে ছায়া কি স্থির থাকিতে পারে? তাই আজ পতি পত্নী এতদূর চিন্তাক্লিষ্ট।

(২)

চারুশীলা বড় লক্ষ্মী মেয়ে—পিতা মাতার একমাত্র আদরের কন্যা হইলেও কখন সে তীব্রভাবাপন্না ছিল না; চারুশীলার মুখে কেহ কখন জোর কথা শুনে নাই, সে পিতা মাতার অমতে কোন কাজ করে না। চারুশীলার চরিত্রের বিশেষ গুণ এই,

যে পিতামাতার অনুরূপ সে এই বাল্যবয়সেই দারিদ্রের প্রতি দয়া মায়া করিতে শিখিয়াছিল। সে তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমার নিকট এইরূপ গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিত; ঠাকুরমাও পৌত্রীকে তাহার আশানুরূপ গল্প শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিতেন।

পূর্ব্বে আমাদের স্ত্রীশিক্ষার এইরূপই সোপান ছিল; বৃদ্ধা গৃহিণীগণের নিকট গৃহস্থধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া বালিকাগণ গৃহকর্ম্মে নিপুণা হইত। এখন কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রবল স্রোত উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া চারিদিকে ছুটিয়াছে; কত গ্রাম, কত নগর এই স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সভ্য সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতেছে; তাই আজ পূর্ব্বের শিক্ষায়—যে শিক্ষায় নারীজাতি শিক্ষিত হইয়া সংসার উজ্জ্বল করিত, হিন্দুর পরম পবিত্র সংসারে যে শিক্ষায় লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইত, এখন সে শিক্ষা দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে; এখন বাল্যকালের সে পবিত্র বার-ব্রত, সেঁযুতি যমপুকুর, পুণ্যপুকুর, উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে নাটক নভেল প্রভৃতির কুরুচিপূর্ণ পুস্তকের শিক্ষায় আমাদের স্ত্রীজাতির কমনীয় হৃদয় কলুষিত হইয়া যাইতেছে। সংসারেও এখন আর সেরূপ সুখ শান্তির একত্র মিলন দেখিতে পাওয়া যায় না।

চারুশীলা এখনও ঠিক যৌবনসীমায় পদার্পণ করে নাই; স্ফুটনোন্মুখ কোরকের ন্যায় তাহার দেহের লাবণ্যছটা বাহির হইতেছে। অস্ফুট অবস্থাতেই এইরূপ সৌন্দর্য্য, ফুটিলে না জানি আরও কত সৌন্দর্য্য হইবে। স্ত্রীজাতির বিবাহের পরই সেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে।

পাঠক! আপনারা চারুশীলাকে দেখিয়াছেন কি? হিন্দুর অবিবাহিতা বালিকা ত বাটীর বাহির হয় না, তাহাকেত দেখি-

যার উপায় নাই, তবে তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাকুরাণীর জীবন্ত প্রতিমা। পাতলা পাতলা গঠন, টুকটুকে রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি, ভাসা ভাসা বড় বড় চক্ষু আকর্ণ বিস্ফারিত, লজ্জা ও সরলতা যেন সে নয়নে চিরতরে আশ্রয় লইয়াছে। দশনপংক্তি যেন মুক্তা দিয়া সাজান, এলাইত কুন্তলদাম অলক্ত রাগরঞ্জিত চরণযুগল স্পর্শ করাইবার জন্য যেন লালায়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। চারুশীলার রূপের তুলনা নাই, সে নিজেই তুলনাস্থল। এক কথায়, বিধাতা যেন নির্জ্জনে বসিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, নিখুঁত সুন্দরী হইলে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, তাহাতে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। সুন্দরী চারুশীলার জীবনের এই ত প্রভাতকাল, জানি না, জীবন মধ্যাহ্নে ইহার অদৃষ্টে বিধাতা কিরূপ লিখিয়াছেন।

(৩)

কন্যার জন্য মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বড়ই ভাবনা হইয়াছে, কেমন করিয়া তাঁহার আদরের একমাত্র ললামভূতা চারুকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিবেন,—কেমন করিয়া কন্যা আমার সুখী হইবে,—যে দিনকাল পড়িয়াছে. তাহাতে ত কন্যা পাত্রস্থ করাই এক প্রকার কঠিন ব্যাপার। যদিও চারুশীলা শতের মধ্যে একটি, যদিও সে রূপে ও গুণে নারীজাতির শীর্ষস্থানীয়া, তথাপি ত দরিদ্রের কন্যা, রূপগুণের বড়াই করা কি তাহার সাজে? এখন সমাজে কি আর রূপ-গুণের আদর আছে? ধর্ম্মের আদর আছে? ধার্ম্মিকের আদর আছে? তাই ধর্ম্মভাবে ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিয়া চারুশীলার পিতাকে কন্যাদায় হইতে

উদ্ধার করিবে? এ যে বড় বিষম সময় উপস্থিত! এখন যে অর্থের আদরই বেশী, অর্থই যে এ সময়ে মূলাধার, এইজন্য মনোহরের অপরূপ লাবণ্যবতী কন্যা এখন অনূঢ়া, এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। এই অর্থের সংসারে যদি তাহার পিতার অর্থ থাকিত, তাহা হইলে কি আর চারুর বিবাহের জন্য তাঁহাকে এত চিন্তা করিতে হইত?

একদিবস মনোহর বাবু সকাল সকাল আপিস হইতে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বহির্বাটীতে বসিয়া কন্যার বিবাহের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। বৈশাখ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে গৃহে থাকা দায়—কিন্তু মনোহর বাবু, পাছে কেহ কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত কথা বলিয়া তাঁহাকে লজ্জা দেয়, এইজন্য তিনি গ্রীষ্মের সময়েও বাটীর বাহির হন নাই, আপন মনে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন; সে চিন্তার বিরাম নাই, মনোহর বাবু তন্ময় যেন জীবনশূন্য দেহের ন্যায় নিস্পন্দভাবে চিন্তাসাগরে ডুবিয়াছেন,—তাহার চৈতন্য নাই; এমন সময় কে তাঁহাকে ডাকিল। বারবার অনেকবার ডাকিল, কিন্তু তথাপি কাহারও উত্তর পাইল না। শিবানী গৃহের ভিতরের দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ও গো, তোমায় কে ডাক্‌ছে।" তথাপি তাহার চৈতন্য হইল না। তখন গৃহিণী গাত্রস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তুমি যখন তখন অমন করে অত ভাব কেন? জগদম্বার মনে যা আছে তাই হবে, ভেবে ভেবে শরীর মাটী কর্‌বার দরকার কি? চেষ্টা কর, অবশ্যই ফল হইবে, চেষ্টার অসাধ্য জগতে কি আছে। এখন যাও, তোমাকে বাহিরে কে ডাক্‌ছে।" মনোহর বাবু দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর ছিলেন, তিনি স্ত্রীর কথায়

কোন উত্তর প্রদান না করিয়া গৃহের অর্গল মোচন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

(৪)

মনোহর বাবু নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বোসজা তাঁহাকে ডাকিতেছে। বোসজা পাড়ার ঘটক—এই বয়সে সে অনেকের বিবাহ দিয়াছে। বোসজা মনোহরকে দেখিয়া যথারীতি প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমি অনেকবার ডেকেছি আপনি নিদ্রা যাইতেছিলেন?"

মনোহর আর কি বলিবেন, অগত্যা তাহাকে বলিতে হইল, "আপিস হইতে আসিয়া অবধি ঘুমাইয়াছিলাম।" তবে, কি মনে করে, খবর সব ভাল ত, আজকাল যে আর তোমায় দেখতে পাওয়া যায় না বোসজা। কোথাও গিয়েছিলে নাকি?"

বোসজা। না, কোথাও যাই নাই; তবে শরীর বড় অসুস্থ ছিল বলিয়া কোথাও বাহির হই নাই।

মনোহর। এখন শরীরটা বেশ সেরেছে ত?

বোসজা। হাঁ! একটা কথা বলছিলুম কি, চারুর জন্ম একটি পাত্র ঠিক করেছি; বেশী কিছু দিতে হইবে না, তাদের এক জায়গায় ঠিক হয়েছিল বিবাহের রাত্রে সে পাত্রীর হঠাৎ কলেরা হইয়া মৃত্যু হওয়ায় তাহারা আজ সকালে আমার নিকট আসিয়াছিল। আমি আপনার কন্যার কথা বলিয়াছি আরও বলিয়াছি, কন্যার পিতা বড় গরিব, অত কিছু দিতে পারবে না। তাহারা বলিল—আমরা এমন কিছু বেশী চাহি না, মেয়েটী ভাল হইলেই হইল।

মনোহর। বোসজা, তবু তাহাদের অভিপ্রায় কিরূপ বুঝিলে এবং পাত্রটী কেমন ও তাহার কে কে আছে?

বোসজা। পাত্রটী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার জননী আছেন, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত, বোধ হয় পাঁচ শত টাকাতেই হইতে পারে; আপনি একবার তাঁহাদের সহিত দেখা করিবেন আসুন, তাহা হইলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে।

মনোহর। কতদূর যাইতে হইবে?

বোসজা। বেশী দূর নয়, ঐ ও পাড়ায়। তুমি কাপড় পর, শুভকাজে আর বিলম্ব কেন?

মনোহর ডাকিল,—"চারু!"

চারুশীলা „যাই বাবা" বলিয়া উত্তর দিতে দিতে বাটীর ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বাহিরে আসিল এবং সম্মুখে বোসজাকে দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"কাকা! তুমি যে আর আস না গা, আমাদের কি ভুলে গেছ?" বোসজাকে চারু বাল্যকাল হইতে কাকা বলিয়াই ডাকিত, সেও তাহাদিগকে বড় ভালবাসিত।

বোসজা বালিকার কথা শুনিয়া বলিল, "না মা! তোমাদের কি ভুলতে পারি, তবে তোমার বর খুঁজতে খুঁজতেই যে বিব্রত হচ্ছি, আর কখন আসি মা?"

বিবাহের কথা শুনিয়া সরলা বালিকার সুন্দর মুখখানি যেন লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া গেল, সে আর কথা কহিতে পারিল না; তখন ধীরে ধীরে বড় বড় চক্ষু দুটি মাটির দিকে নামাইয়া অধোবদনে রহিল।

মনোহর বাবু বলিলেন, "মা! তোমার বোসজা কাকার জন্য একটু তামাক আনিয়া দাও ত।" বোসজা বাধা দিয়া "আর

এখন তামাকে কাজ নাই; এখন তুর্গা বলে চল, আগে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসি।" মনোহর বাবুও আর বিলম্ব না করিয়া উভয়ে পাত্র দেখিতে গমন করিবেন। সেখানে সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গেল, পাঁচ শত টাকা নগদ ও দশ ভরি সোণা দিলেই হইবে; পাত্রটী দেখিয়া মনোহর বাবুর বড় পছন্দ হইয়াছিল, কাজেই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

মনোহর বাবু বাটী আসিয়া জননীর ও স্ত্রীর নিকট সমস্ত কথা বলিলেন। শিবানী কত দেবদেবীর পূজা মানসিক করিয়া পয়সা তুলিয়া রাখিলেন।

পাত্র ত স্থির হইল, এখন অর্থ কোথায়? মনোহর কি করিবেন, তাঁহার বহুদিনের পৈত্রিক গৃহখানি বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। হায়! কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া এতদিনে মনোহরের গাছতলা সার হইল। এরূপ করিয়া কন্যার বিবহের জন্য যে কত শত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছারখার হইতেছে; স্ত্রী পুত্র লইয়া কত শত লোক যে পথের ভিখারী হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে! পূর্ব্বে নীচজাতির মধ্যে অর্থ দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হইত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে পুত্র বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে, যাহার পুত্র আছে, তাহার আবার অর্থের অভাব কি? বিবাহের সময়েই ত অজস্র অর্থ সমাগম হইবে। তাহার উপর পুত্র যদি কথঞ্চিৎ শিক্ষিত হয়, সে যদি দুই একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে ত কথাই নাই! এই ত সমাজ, এই ত তাহার অবস্থা! এখন আমাদের দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই; যে সকল কার্য্য করিলে দেশের মঙ্গল হইবে, সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই; কেবল বাগাড়ম্বর করিয়া দেশো-

ন্ধারের জন্ত সকলেই ব্যস্ত। মনোহর অর্থ কর্জ্জ করিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

শুভদিনে শুভলগ্নে যথাবিধানে চারুশীলার বিবহকার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দিন চারুর সই মনোরমা ও তাহার মাতা নিমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের বাটী আসিয়াছিলেন। মনোরমা আসিবার সময় চারুশীলার জন্য একখানি কাপড় আনিয়াছিল। কাপড়খানি তাহার সইকে পরাইয়া বলিল, "ভাই! যখন এই কাপড়খানি তুমি পরিবে, তখন তোমার এই সইয়ের কথা মনে পড়িবে।"

মনোরমা তার সইয়ের বিয়েতে বড় আমোদ করিয়াছিল, বরকে কত তামাসা করিয়াছিল—অবশেষে তাহার কোমল কণ্ঠে একটি গান শুনিবার জন্য বাসরে কত সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল। মনোরমার সে গানটি এত ভাল লাগিল যে, অবসর পাইলেই সেই গানের দুই এক কলি আপন মনে গুণগুণ করিয়া গাহিত। বিবাহের পর বাসী বিবাহের দিন মনোরমা তাহার সইকে কত রকম করিয়া চুল বাঁধিয়া দিল। শেষে যখন চারুশীলা পাল্কীতে উঠিল, তখন হঠাৎ মনোরমার চক্ষে জল আসিল, ঝটিকাপসারিত মেঘের ন্যায় আমোদ আহ্লাদ কোথায় উড়িয়া গেল। হৃদয়াবেগ উঠিল—অবরোধ না মানিয়া দুই এক ফোঁটা করিয়া নয়নকোণে অশ্রু আসিয়া দেখা দিল। চারুশীলা তাহার সইয়ের চখে জল দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"সই! তুমি কাঁদছো?" মনোরমা বলিল, "জানি না সই, আবার কবে দেখা হবে। আমরা কিছুদিনের জন্য এখানে থাকিব না—বাবা ভাগলপুরে বদলী হইয়াছেন।"

আর অধিক কথা হইল না—দেখিতে দেখিতে বেলা অধিক হইতে লাগিল, বর ও কন্যা যথারীতি বিদায় প্রাপ্ত হইল।

চারুশীলার বিবাহের পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার একটী কন্যা হইয়াছে। চারুশীলার শ্বশুরবাটী অনেক দূর নহে; একটী অরণ্য মাত্র ব্যবধান, অরণ্যের পরই কপিলপুরে তাঁহার শ্বশুরালয়, চারুশীলা নিজের গুণে শ্বশুরবাটীর সকলের নিকট আদরণীয়া হইয়াছেন; তাহার সরল স্বভাবের গুণে মামাশ্বশুর, মামাশাশুড়ী ও শ্বশ্রূদেবী তাহাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; সরলা চারুশীলার ন্যায় আদর্শ গৃহিণীর গৃহিণীপণায়, সংসারকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিণী থাকায়, অল্পদিনের মধ্যে তাহার স্বামীর সংসারে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে।

স্ত্রী সংসারের লক্ষ্মী, যে সংসারে স্ত্রীজাতি লক্ষ্মীছাড়া, সে সংসারের সুখ শান্তি কোথায়? কর্ণধার পাকা না হইলে তরণীর যে অবস্থা হয়, পাকা গৃহিণী বিহনে সংসার-তরণীরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে; কারণ স্ত্রী যে সংসারের সাররত্ন।

বহুদিন হইতে চারুশীলার শ্বশ্রূঠাকুরাণী পুরুষোত্তম দর্শনের মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই;—এখন বধূমাতা গৃহিণী হইয়াছেন, এখন তাহার উপর ভার দিলে, তাহার পুত্রের কোন কষ্ট হইবে না। এইজন্য তিনি পাড়ার কয়েকটি স্ত্রী সঙ্গিনী স্থির করিয়া পুরুষোত্তম যাইবার মনস্থ করিলেন এবং পরদিন শুভযাত্রা করিবার মানসে বৈবাহিক বাটীতে চারুশীলাকে লইয়া যাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা বলিলেন, যখন সংবাদ

দেওয়া হইয়াছে, তখন বৌমা কাল নিশ্চয়ই আসিবেন; তুমি প্রাতঃকালেই রওনা হইও, কোন চিন্তা নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে চারুশীলার শ্বশ্রুদেবী সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সঙ্গিনীগণের সহিত পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্র যাইতে হইলে এক প্রকার সমস্ত আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইত, কারণ পূর্ব্বে যাতায়াতের এত সুবিধা ছিল না।

কলির দেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অধিষ্ঠানক্ষেত্র পুরুষোত্তম, হিন্দুর একটি মহাতীর্থ স্থান, এখানে মান, অপমান, অহঙ্কার, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি ভেদাভেদ নাই; এস্থানে সমস্তই একাকার। একজন চণ্ডাল আসিয়া যদি তোমার বদনে অন্ন প্রদান করে, তাহা হইলে তোমাকে তাহা অম্লানবদনে গ্রহণ করিতে হইবে। মরি মরি, এই পরম পবিত্র তীর্থ স্থানের দৃশ্য কি মনোহর! দেখিলে নয়ন মন চরিতার্থ হয়, হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। বাস্তবিক কাহারও হৃদয়ে ভেদজ্ঞান থাকে না।

এখন হিন্দুর যাহা কিছু আছে, এস্থান সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য যাহা কিছু নয়নগোচর হয়, তাহা আর কোন ধর্ম্মে নাই। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর অন্য যাহা কিছু থাকুক বা না থাকুক, ধর্ম্মভাব যাহা এখনও বর্ত্তমান, তাহা অন্য জাতির অনুকরণীয়, অন্যের পক্ষে সে সমস্ত যে পর্ব্বত বিশেষ তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কন্যার বিবাহ দিবার পর মনোহর বাবুর কষ্টের একশেষ হইয়াছে, যাঁহার নিকট টাকা ধার করিয়াছিলেন—তিনি মনোহরের অবস্থা দেখিয়া আর টাকা ফেলিয়া রাখিতে চাহেন না;—

হয় তাঁহার টাকা পরিশোধ করা হইক—না হয় বাস্তুভিটাটী ছাড়িয়া দিয়া ঋণদায় হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করুন, কুসীদজীবী মহাজনের এখন এইরূপ অভিপ্রায়।

মনোহরবাবু নিষ্ঠুর প্রকৃতি মহাজনের ব্যবহারে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন; কি করিবেন, কাহার শরণাপন্ন হবেন, কে তাঁহাকে এই দুঃসময়ে অর্থ সাহার্য্য করিয়া দুরন্ত মহাজনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবে—ইত্যাদি চিন্তায় তিনি বড়ই কাতর হইয়াছেন। এ সংসারে অর্থহীন হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল—অর্থ না থাকিলে ইহসংসারে তাহার মান সম্ভ্রম ব্যায় থাকে না—তাহার যাবতীয় গুণ সমস্ত অগ্নিতে তুলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়।

মনোহর বাবু একদিন আপিসের কয়েকটি বন্ধুর কথানুযায়ী তাহাদের বড় সাহেবকে নিজের দুঃখ জানাইলেন। সাহেব মহোদয় বড়ই উদার প্রকৃতি লোক ছিলেন। মনোহরের কথা শুনিয়া তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বিনাসুদে মনোহরকে পাঁচশত টাকা প্রদান করিয়া যাবতীয় চিন্তার হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।

চারুশীলা পিতার এতাদৃশ কষ্ট দেখিয়া কল্য শ্বশুরালয়ে রওনা হইতে পারে নাই। অদ্য বৈকালে পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া শুভযাত্রা করিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চারুশীলার শ্বশুরবাটী বেশীদূর নয়—একটী অরণ্য ব্যবধান মাত্র; তিনি অপরাহ্নে একখানি গোযানে আরোহণ করিয়া কন্যা সহ গমন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে আর কেহই ছিল না। চাঁরুর হস্তে দুইগাছি সুবর্ণ বলয় ও কটীদেশে একছড়া রূপার গোট ভিন্ন আর কিছু অলঙ্কার ছিল না।

গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতে রাত্রি হইল। চারুশীলা কন্যাটীকে বস্ত্রের দ্বারা আবরিত করিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল। গাড়োয়ান পরিচিত, তাহার দ্বারা কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে যাইতে লাগিল।

লোভ বড় ভয়ানক রিপু—ইহাকে সহজে দমন করা যায় না। পাষণ্ড গোচালকের মনে লোভ উপস্থিত হইল; নির্জ্জন স্থান, তাহাতে রাত্রিকাল, এক্ষণে স্ত্রীলোকটিকে মারিয়া অলঙ্কারগুলি লইতে পারিলে কেহই জানিতে পারিবে না। এই মনে করিয়া সে বিপথে গাড়ী চালনা করিতে লাগিল। চারুশীলা কিয়দ্দূর গমন করিয়া বলিল, "গাড়োয়ান! তুমি এরূপ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছ কেন? এদিকে ত যাইবার পথ নহে। গাড়োয়ান কোন কথা শুনিল না—দুরন্ত গভীর অরণ্যের ভিতর লইয়া গিয়া চারুশীলা ও তাহার কন্যাকে লতাপাশে আবদ্ধ করিল। চারুশীলা তখন নিজের ও কন্যার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া, তাহাকে কত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই দুরাত্মা দস্যুর মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। সে তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে একখানি কুড়ালী লইয়া আসিয়া তাহাদিগকে কাটিতে উদ্যত হইল। চারুশীলা আর কোনও উপায় না দেখিয়া সেই নিরুপায়ের উপায়-দাত্রী বিপদ-নাশিনী অভয়ার শরণ গ্রহণ করিল। সতীকুল-সিমন্তিনী জগদম্বা সাধ্বী সতী চারুশীলার এই ঘোরতর বিপদ-জনিত কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন। পাপাত্মা দস্যু যেমন কুড়ালী উত্তোলন করিয়া আঘাত করিবে, অমনি কুড়ালীর ফলাটা খুলিয়া গিয়া একটি গর্ত্তে পড়িল। পাষণ্ড দস্যু লোভে আত্মহারা

—সে তাড়াতাড়ি গর্ত্ত হইতে ফলাটী লইয়া আঘাত করিবার মানসে যেমন গর্ত্তমধ্যে হস্ত প্রদান করিল, অমনি কি হস্তে জড়াইয়া গেল, আর হস্ত তুলিতে পারিল না; কত টানাটানি করিল, কিছুতেই সে হস্ত বাহির করিতে পারিল না। চারুশীলা আসন্ন বিপদে পতিত হইয়া পূর্ব্বেই সংজ্ঞা-হীনা হইয়াছিল—দুরাত্মার দুষ্কর্ম্মের কষ্ট ভোগ কিছুই দেখিতে পাইল না।

উপসংহার।

পাঠক! ব্যাপার কিছু বুঝিলেন কি? সাধ্বী চারুশীলার সঙ্গে যদিও কোন লোক ছিল না, কিন্তু ধর্ম্ম যে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। ধর্ম্মই কালসর্প রূপ ধারণ করিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পাপিষ্ঠ সে ধর্ম্মের নিকট হইতে কি আর হস্ত ছাড়াতে পারে। সমস্ত রাত্রি টানাটানি করিয়া, শেষে বিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

পরদিন এই সংবাদ চারিদেক রাষ্ট্র হইল; পুলিস ঘটনাস্থলে আসিয়া লাশ চালান দিল এবং চারুশীলার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া পুলিসে লইয়া গেল। চারুশীলার স্বামী ও শ্বশুর এ সংবাদ পাইয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন। চারুশীলার সতীত্ব তেজ দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল।

সুখের সংসার।

সুখের সংসার।

পরিবর্ত্তনশীল অদৃষ্টচক্রের গতি বুঝা ভার। ইহা যে কখন কিরূপ ভাব ধারণ করিয়া ক্রীড়ার পুত্তলী-মানবকে হাসায় কাঁদায়, তাহা কে বলিতে পারে। মহামায়া কুলীনের মেয়ে,—বড় গরীব হইলেও এতদিন সে বেশ সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিল, স্বামী-সোহাগে জীবন-মধ্যহ্ন পর্য্যন্ত তাহার কোনও কষ্ট হয় নাই, সদাই হাস্তরসে প্রমত্তা হইয়া এই দুঃখের সংসারে সুখের খেলা খেলিয়া তিনজনে বেশ একভাবে জীবন কাটাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে কে কবে চির-সুখ ভোগের অধিকারী হইতে পারিয়াছে!

দেখিতে দেখিতে মহামায়ার অদৃষ্টনেমী হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার পরম পূজনীয় স্বামী হঠাৎ কালকবলে পতিত হইল, অভাগিনী মহামায়া জগতের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া চির বৈধব্য-যন্ত্রণার অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। মহামায়ার বয়স এখন চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, এতদিন স্বামীসুখে কাল কাটাইয়া জীবনের সন্ধ্যাকালে সে ঘোর অন্ধকারে ডুবিল, দুরন্ত কাল তাহার সংসার-সুখাভিনয়ের যবনিকা ফেলিয়া দিল। হিন্দু রমণীর বৈধব্যের তুল্য যন্ত্রণ আর কি আছে। যে জীবিত

থাকিলেও মৃত, নিকটে থাকিলেও কেহ তাহাকে ডাকে না, কেহ তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না, তাহার ভাল কাপড় থাকিলেও পরিবার যো নাই, ভ্রমর কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশরাশির সংস্কার করিবার তাহার অধিকার নাই, রূপ থাকিলেও তাহা দেখাইবার যো নাই, সে জগতের একটী প্রান্তে একাকিনী পড়িয়া সেই কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে। সহানুভূতি করিবার লোক এ জগতে তাহার আর নাই, মরিয়া যাইলেও কেহ তাহার প্রতি ফিরিয়া চায় না। হিন্দু বিধবার তুল্য হতভাগিনী বুঝি জগতে আর কেহ নাই? মহামায়া দরিদ্রের গৃহিণী হইলেও এতদিন সে কিছুই জানিতে পারে নাই। হিন্দু স্ত্রী স্বামীসুখে সুখিনী হইতে পারিলে, অনন্ত দুঃখকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে; স্বামী-সোহাগে থাকিয়া অন্যপ্রকার সহস্র দুঃখকেও হিন্দুরমণী দুঃখ বলিয়া মনে করে না। অন্যান্য জাতীয়া রমণীগণের অপেক্ষা এইটুকুই হিন্দুরমণীর বিশেষত্ব এবং এই জন্যই তাহারা সকলের আদর্শ।

মহামায়ার যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহার পুত্র হইবার বয়স অতীত হইয়াছে দেখিয়া প্রতিবাসিনী সকলেই মনে করিয়াছিল—তাহার আর পুত্রাদি হইবে না, কিন্তু অদৃষ্টে ফল থাকিলে—তাহার অন্যথা হইবার নয়। কিছুদিন পরে তাহার পুত্রের পরিবর্ত্তে একটী কন্যারত্ন লাভ হইয়াছে। এখন পেটের কোলে কন্যাটীর বয়স একাদশ বৎসর—নাম কমলা। কমলা রূপে গুণে বড় মন্দ নহে, তবে তাহার রূপ যে কাঁচা সোণার মত বা লাল ফুটন্ত গোলাপের মত ছিল তাহা নহে। যেরূপ থাকিলে মধ্য-

বিত্ত গৃহস্থের গৃহ আলোকিত হয়, যে রূপ থাকিলে কেহ ঘৃণা না করিয়া সকলেই তাহার হাতের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে, কমলার রূপ সেইরূপই ছিল। কলিকা প্রস্ফুটিতা হইবার পূর্ব্বে স্বভাবতঃ সতেজ রূপ ধারণ করে। কমলা-কলিকার ফুটীবার সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন সতেজভাব ধারণ করিয়া রূপের ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি হইতেছে। এখন দেখিলে তাহাকে রূপসী না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ রূপের সহিত তাহার সেই সলজ্জস্বভাবের সংমিশ্রণ হওয়ায় সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বাড়িয়াছে, আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। রূপ লজ্জার আবরণে আবরিত হইলে, এইরূপ সুন্দর হইয়া থাকে। যাহার লজ্জা নাই, সে পরমাসুন্দরী হইলেও তাহার রূপ মনো-নয়নের তৃপ্তিকর হয় না, নির্লজ্জা স্ত্রীলোকের রূপ থাকিলেও তাহার শোভা নাই। রূপের মাধুরী বাড়াইতে হইলে লজ্জাই তাহার একমাত্র উপকরণ।

(২)

মহামায়ার স্বামী ধর্ম্মানন্দ মুখোপাধ্যায় আজ এক বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। ধর্ম্মানন্দ দেশীয় জমিদারের অধীনে সামান্য বেতনের গোমস্তাগিরি চাকুরী করিতেন। যাহা আয় ছিল,—তাহাতে একরূপ কষ্টে সংসার চলিত, তবে মহা-মায়ার ন্যায় গৃহিণীর গৃহিণীপনায় ধর্ম্মানন্দের সংসারে কোনরূপ অনাটন হইত না। মহামায়া নিজ কার্য্যদক্ষতা গুণে ঐ অল্প আয়েই বেশ গুছাইয়া চলিতেন। দেখিলে সহজে কেহই তাহা-দের দরিদ্রতার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিত না। ধর্ম্মানন্দ

অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল প্রতিপালন করিতেন, ত্রিসন্ধ্যা ও বিষ্ণুপূজাদি না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অবধি তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই জন্য তিনি ইংরাজী লেখা পড়া জানিলেও সরকারী চাকুরী করিতে পারেন নাই। ধার্ম্মিক ধর্ম্মানন্দ ধর্ম্মকার্য্যেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রতিদিন আহারাদির পর অপরাহ্নে তিনি প্রভুর কাজে বাহির হইতেন। ইহকালের জন্য অল্প মাত্র সময় নষ্ট করিয়া পরকাল চিন্তাতেই তিনি সর্ব্বক্ষণ বিব্রত থাকিতেন। উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি এ কার্য্যে তিলমাত্র অবহেলা করিতেন না। মহামায়াও সে কালের স্ত্রী, ধর্ম্ম কর্ম্মে স্বামীর সহায়তা করিয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংসারে ধর্মকে সহায় করিয়া মহামায়া স্বামী ও কন্যাটীর সহিত একদিনের জন্য কোন কষ্ট পান নাই। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না—চিরসুখ কাহার ভাগ্যে ঘটে না বলিয়া, মহামায়া স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আজ একবৎসর সাতিশয় কষ্ট অনুভব করিতেছেন।

বিলাসপুরে তাহার শ্বশুরবাড়ী, স্বামীর মৃত্যুর পর দুহিতাকে লইয়া সেই নিবান্ধবপুরীতে তাঁহার থাকিতে আর মন উঠিল না। এখানে তাঁহার কোন আত্মীয় নাই, যে বিপদে আপদে তাঁহাদের দেখিবে। বিশেষতঃ কমলা বড় হইয়াছে, আর তাহার বিবাহ না দিলে ভাল দেখায় না, যেমন করিয়া হউক এই বৎসর তিনি কন্যার বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন। বিবাহে অর্থের আবশ্যক, কিন্তু

তাঁহার ত অর্থ নাই, অবশেষে তিনি নিজের বাস্তু বিক্রয় করতঃ দুইশত টাকা মাত্র সংগ্রহ করিয়া পিতৃগৃহ কুমারপুরে আগমন করিলেন। পিতৃকুলে এখন তাঁহার বৃদ্ধা জননী কনিষ্ঠ সহোদর বধূ ও দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমান, ভ্রাতার অবস্থাও তথৈবচ, তিনিও ছাপোষা লোক। তবে হিন্দু হাজার দরিদ্র হইলেও এইরূপ নিরাশ্রয় আত্মীয়কে ফেলিতে পারে না। ভ্রাতা রুদ্রাম ভগ্নীকে আশ্রয় দিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। হিন্দু যতই দরিদ্র হউক না কেন, তাহারা চিরকাল এ প্রথার অনুমোদন করিবে।

রুদ্রাম ভগ্নীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"দিদি তুমি আর শোক করিও না, যদি আমরা দিনান্তে একমুঠা খাইতে পাই, তাহা হইলে কমলা ও তুমি বাদ পড়িবে না।

মহামায়া বলিলেন—"ভাই! ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, পুত্রটী তোমার চিরজীবী হউক, চাট্টি ভাতের ভাবনা যে ভাবিতে হইবে না—তাহা আমি জানি। কিন্তু ভাই! এখন কমলার ভাবনাই আমার মহা ভাবনা হইয়াছে। এক্ষণে ঐ দুইশত টাকার মধ্যে যা'তে তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর, এখন ত এ ভার তোমার উপরেই পড়িল, তুমি না করিলে আর আমার কে আছে? রুদ্রাম বলিলেন—"দিদি! আমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত নাই, প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, এখন বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেই শুভকার্য্য সমাধা হয়। এইরূপে ভ্রাতা ভগ্নীতে কমলার বিবাহের বিষয় লইয়া ঘোর চিন্তায় পড়িলেন। দরিদ্র কুলীনের ঘরে কন্যা বড় হইলে, তাহাদের কিরূপ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে হয়—তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

(৩)

পূর্ব্বে আমাদের সমাজে বিবাহের বড়ই বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল। এখন সে নিয়ম অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে সমান ঘর ও সৎপাত্র না হইলে বিবাহ হইত না। এখন আর ঘর বর তত কেহ দেখে না। এখন অর্থের সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; অর্থ থাকিলে, সে কুলীন না হইলেও কুলীন পদবাচ্য, সে নির্গুণ হইলেও গুণবান। পূর্ব্বে কিন্তু অর্থের জন্য কেহ জাতি মর্য্যাদা নষ্ট করিত না। যে যেমন ঘর, সে সেইরূপ ঘরেই কন্যা সম্প্রদান করিত। দেখিবার মধ্যে দেখিত কেবল পাত্রটীকে; পাত্রটী সৎপাত্র হইলেই তখনকার লোক কন্যা সম্প্রদান করিতে দ্বিধা ভাবিত না। এখন সৎপাত্র ও স্বঘর দেখিয়া বিবাহ হয় না, তাহার বিষয় আশায় কিরূপ আছে—ইহা প্রথম লক্ষ্যস্থানীয় হইয়াছে। তখন সৎপাত্রে কন্যাদান সকলেরই লক্ষ্য ছিল। হিন্দু চিরকাল অদৃষ্টবাদী; তাঁহারা জানিতেন অদৃষ্টে সুখ থাকিলে কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম হইবে না! বাস্তবিক পাত্র চরিত্রবান হইলে, তাহাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে কষ্ট হইবার কোন কারণ নাই; যেমন করিয়াই হউক, সে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিবে, নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে না পারিলেও চরিত্রবান স্বামী তাঁহার স্ত্রীপুত্র লইয়া একরূপ সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। নতুবা তুমি যতই ধনীর পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান কর, তাহার সুখ হইবে না। আজীবন একটা না একটা মহা কষ্টে তোমার প্রাণের কন্যা দুঃখ পাইবে! এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা শত শত চক্ষে সম্মুখে দেখিতেছি। কৃষ্ণরাম

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স বেশী না হইলেও তিনি পূর্ব্বের প্রথা বড় ভাল বাসিতেন। তিনি জানিতেন কন্যার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা নিশ্চয়ই হইবে ; তবে পিতামাতা বা অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য যে যাহাতে কন্যা সৎপাত্রে পড়ে। আর তিনি ধনী সৎপাত্রই বা কেমন করিয়া সংগ্রহ করিবেন, সেরূপ পাত্রের মূল্য যে অনেক, কাজেই তাঁহাকে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথচ কমলার মুখের দিকে চাহিতে হইবে ; জাতিকুল বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। রুদ্ররাম আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য মনে মনে স্থির করিয়া ভাগ্নেয়িটীর জন্য যথাসম্ভব সৎপাত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

(৪)

আমরা যতই কেন আস্ফালন করি না, জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ বিষয়ে আমাদের কোন আস্ফালনই সাজে না। ইহা ঈশ্বরাধীন কার্য্য—ইহাতে মানবের কোন হাত নাই। পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে ভগবানের কৃপায় মাতৃস্তন্যে যেমন দুগ্ধের সঞ্চার হয়, কন্যা জন্মাইবার পূর্ব্বে তাহার পাত্রের জন্মগ্রহণও সেইরূপ বিধাতৃবিধান, তবে চেষ্টা করিয়া সেই পাত্রটির সন্ধান করিতে হইবে, তাহা হইলে আর কেন চিন্তা করিতে হইবে, আপনাপনি কোথা হইতে সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে ; কোন বাধাই মানিবে না। যতদিন সেই বিধি নির্দ্দিষ্ট পাত্রের সংযোগ না হইবে, তত দিন তুমি যত চেষ্টাই কর, একটা না একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবে! ধনী ও দরিদ্র সকলের পক্ষেই এই নিয়ম, এ

নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। এই জন্যই বলিতে হয় জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরাধীন, ইহাতে মানবের কোন সাধ্য নাই!

রুদ্ররাম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আজ তিন মাস হইল নানা স্থানে কমলার জন্য পাত্রের সন্ধান করিতেছেন। কমলার বিবাহের জন্য শুধু রুদ্ররামের ভাবনা নয়, তাঁহার জননী, ভগ্নী ও স্ত্রী সকলেই মহা ভাবিতা হইয়াছেন। চেষ্টা করিলে কিনা হয়; বিশেষতঃ যখন ভবিতব্যের ভাগ্য--সূত্রের আকর্ষণ রহিয়াছে; তখন চেষ্টা করিলে অবশ্য পাত্র মিলিবে। যে যেমন, তাহার সেইরূপ সংযোগই হইবে। 'যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে' শাস্ত্রের কথাটা আদৌ মিথ্যা নহে। রুদ্ররাম বহুকষ্টে ছয় মাসের পর গোবিন্দপুরে নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের সহ কমলার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। নিত্যানন্দ গোবিন্দপুরের স্কুলে ২৫৲ টাকা বেতনের পণ্ডিত ছিলেন। সংসারে স্ত্রী, চারিটী পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাটির বিবাহ দিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই দায়োদ্ধার হইয়াছিলেন। চারিটী পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মনমোহন্ গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পিতার অবস্থা তাদৃশ ভাল নয় বলিয়া তিনি ইচ্ছা সত্ত্বেও আর পড়িতে পাইতেছেন না। ইহাতে তাহার মনে ভয়ানক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ অর্থাভাবে পড়িয়া পুত্রের ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে পড়াইতে পারিতেছেন না;—ইহাতে তিনি যে হৃদয়ে কিরূপ দুঃখ পাইতেছেন—তাহা সহজেই বিবেচ্য। পুত্রের লেখা পড়া হইতেছে না, ইহাতে কোন্ পিতামাতা সুখী হন্। নিত্যানন্দ এক বেলা আহারের বন্দোবস্ত করিয়া পুত্রের পাঠের

জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই মাস পরে তিনি পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এরূপ অল্প আয়ে সংসার চালাইয়া একটী পুত্রকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা বড়ই কষ্টকর, নিত্যানন্দ ক্রমশঃ বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

কাহাকেও ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেখিলে জগ-তের লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়—তাহাদের হিংসাবৃত্তি প্রবল হয়, স্বার্থপর জগতের রীতিই এইরূপ। তোমার উন্নতিতে জগতের সকলেই হিংসা করিবে, প্রত্যক্ষে না হউক পরোক্ষেও করিতে ছাড়িবে না। কিন্তু পিতা অপেক্ষা পুত্র যদি ধনী বা শিক্ষিত হয় —তাহা হইলে তাহাতে কেবল পিতামাতার কোনও রূপ হিংসার উদয় হয় না। পুত্র পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইলে তাহার অল্পশিক্ষিত পিতার মনে কোনরূপ নীচ প্রবৃত্তি প্রবল হইবে না। স্বার্থপর জগতে এমন নিঃস্বার্থপর বন্ধু, ইহকালের একমাত্র দেবতা, পুত্রের আর কে আছে?

নিত্যানন্দ যখন পুত্রের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় লইয়া মহা বিব্রতে পড়িয়াছেন; কি করিবেন, কি করিলে তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, এই চিন্তায় তিনি যখন মহা চিন্তিত, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সেই সময়েই রুদ্ররাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রুদ্ররাম পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জাত্যাংশের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মিনতি করিয়া তাঁহার নিকট পুত্রের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। প্রথমতঃ এত অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দিতে নিত্যানন্দের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া শেষে তাহাতে স্বীকৃত হই-

লেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। কুলীনের মর্য্যাদা স্বরূপ দুইশত টাকা নগদ লইয়া তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন—"ভাই! আমার বিবাহ দিতে এখন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মনমোহনের পাঠের ব্যয়ানুকূল্য জন্য ২০০৲ টাকা নগদ গ্রহণ করিতেছি। তবে অন্য বিষয় আমার কিছু বক্তব্য নাই, তুমি যেরূপ করিলে কোনরূপ কষ্ট হইবে না—তাহাই করিবে, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। এ বিবাহে ভবিতব্যের স্থির সংযোগ হইয়াছে বলিয়া আর কোন গোলযোগ হইল না।"

শুভদিনে শুভক্ষণে মনমোহনের সহিত কমলার শুভ পরিণয় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। মহামায়া আজ একটী মহা চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। তাঁহার প্রাণের কন্যা কমলাকে প্রার্থনীয় পাত্রে সমর্পণ করিয়া সুখী হইলেন। রুদ্ররামও একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া নিজে সন্তুষ্ট হইলেন। মনমোহন নির্ব্বিঘ্নে কলেজে পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই তাহার পিতার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, ক্রমশঃ নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি দৃষ্টি-শক্তিহীন হইয়া গেলেন। এই সময় হইতেই মন-মোহনের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত হইল। মনমোহনের আশা ভরসা এককালে লোপ পাইল। অগত্যা তাহাকে কলেজের পাঠ বন্ধ করিয়া পিতার কার্য্যে ব্রতী হইতে হইল। নতুবা তাহার পূজনীয় পিতামাতার ও স্নেহের ভ্রাতা দুইটীকে প্রতি-পালন করিবে কে?

দুঃখ যখন মানবকে আক্রমণ করে, তখন তাহার দলবল সহ আসিয়া উপস্থিত হয়। মনমোহন বৎসরেক মাত্র পিতার পদে কার্য্য করিতে না করিতে তাহার জননী স্বামীর পীড়ার জন্য এবং অহোরাত্র সংসারে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া অপটু হইয়া পড়িলেন। কাজেই মনমোহনকে বাধ্য হইয়া তাহার স্ত্রীকে আনিতে হইল, নতুবা তাহার সংসার অচল হয়; সমস্ত দিন অর্থের চিন্তায় তাহাকে কার্য্য স্থানে থাকিতে হইলে, কেই বা ছোট ছোট ভ্রাতাগুলিকে দেখে, আর কেই বা বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করে, একা ত সকল দিক বজায় রাখা যায় না?

কমলা এখন গৃহের কাজ কর্ম্ম সমস্তই শিখিয়াছেন। মহামায়ার ন্যায় গৃহিনীর নিকট গৃহকর্ম্ম শিখিতে তাহার কয় দিন যায়। বিশেষতঃ তিনি দরিদ্রের কন্যা, গৃহকর্ম্ম তাহার অবশ্য জানা কর্ত্তব্য। তাহা ব্যতীত কমলা রামায়ণ মহাভারত বেশ পড়িতে পারিতেন। তাঁহার মাতামহী অবসর সময়ে কমলাকে কীর্ত্তিবাসী বা কাশীরাম দাসের রামায়ণ, মহাভারতের বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিতেন। অকিঞ্চিৎকর নাটক, নভেল পাঠে তাহার তাদৃশ রুচি ছিল না। এখনকার স্ত্রীলোকেরা যেমন লেখা পড়া জানিলে একটু শিক্ষার অহঙ্কার দেখান, তখন স্ত্রীলোকগণ শিক্ষার বিষয় কিম্বা আহারাদির বিষয় পুরুষের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিতা হইত।

কমলা আজ এক বৎসর হইল, শ্বশুর বাটী আসিয়াছেন। এই অল্প বয়সেই তিনি স্বামীর দুঃখের ভাগ লইতে শিখিয়াছেন,

তিনি এখনকার রমণীগণের মত স্ব ইচ্ছায় কোন কাজ করিতেন না। গৃহকর্ত্রী শ্বশ্রুদেবীর মত হইয়া সমুদয় কাজ করিতেন। ছোট ছোট দেবরগুলিকে সহোদরের ন্যায় যত্ন করিতেন। কমলা অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া কিসে সংসারের সংকুলন হইবে, কিসে সংসার ভালরূপ চলিবে, কিসে স্বামীর মনস্তুষ্টি করিতে পারিবেন—ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার গৃহিনীপণা দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। দরিদ্র কন্যা শ্রমশীল না হইলে তাহার কষ্টের এক শেষ হয়। মনমোহনের জননী বিন্দুবাসিনী বধুমাতার গুণে বশীভূতা হইলেন। কমলা এখন আর বৃদ্ধা শ্বশ্রুদেবীকে কিছু-মাত্র পরিশ্রম করিতে দেন না। বিন্দুবাসিনীকে কেবল কর্ত্রীর কার্য্য করিতে হয়; কমলা শ্বশ্রুদেবী থাকিতে আর কর্ত্রী পদে নিযুক্ত হইতে চাহেন না। মনমোহন পিতার ন্যায় অতি অমায়িক প্রকৃতি সম্পন্ন, সকলেই তাহার গুণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না; এক্ষণে তাহার স্ত্রীর গুণে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাহাদের এই শুভ মিলনের প্রশংসা করিতে লাগিল।

(৬)

কমলার আগমনে গৃহের পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যেন পুনরায় উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। মনমোহন প্রতি মাসে সংসার খরচের দ্রব্যাদি জননীর নিকট আনিয়া দেন। জননী সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দৈনন্দিন খরচের সমস্ত দ্রব্যাদি বধু-মাতাকে প্রদান করিতেন। কমলা সেই দৈনিক খরচের দ্রব্য দেড় দিন করিয়া চালাইতেন। শ্বশ্রুদেবী যে তণ্ডুল প্রত্যহ রন্ধন

করিতে দেন, ... একমুষ্টি বাচাইয়া রন্ধন করিতেন. "... হবে" এরূপ মনে করিয়া আজিকার ... সার চালাইতেন। কমলার প্রাণান্ত পরি... স্ত্রীর নিকট দিন দিন বশংবদ হইতে ... স্ত্রীর গুণে কোন স্বামী না মুগ্ধ হয়।

মনমোহন ও ... লেখা পড়ার উন্নতি করিতে একদিনের জন্য ... যোগে আহারাদির পর তিনি প্রায় সম ... টি. কুমার প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে ... দুই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি বেশ সংস্কৃত শিক্ষায় পারদর্শী হইলেন। এই সময় ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে, মনমোহন আবেদন করিলেন, অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইল। মনমোহন প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া বেশ দক্ষতার সহিত বালকগণকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেতনও বৃদ্ধি হইল। সংসার বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল। কমলার প্রাণান্ত পরিশ্রম ও মনমোহনের একান্ত অধ্যবসায় এবং একান্ত ধর্ম্মানুরাগে তাহাদের সংসার আবার শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। পাঠক! বলিতে পারেন কি? ইহা কার গুণে? আমরা বলি—ইহা দুইটীরই গুণে। দুইটী জিনিস সমান ভাবে একত্র হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। দুই দ্রব্য একত্র হইলে; স্বামী স্ত্রীর দুইটী মন একত্র সম্মিলিত হইলে সংসার এইরূপ শান্তি-

মগ্ন হয়। সেরূপ সংসারে থাকিয়া দুঃখ-দাবদগ্ধ মানব অনায়াসেই সুখ লাভ করিতে পারে। সংসারাশ্রম মানবের পরীক্ষা-স্থল। এস্থলে প্রবেশ করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার জীবন ধারণ সার্থক হইয়াছে, সে ধর্ম্মবীর নামে খ্যাত হইতে পারে। আমাদের পূর্ব্বকালের পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ কেহই সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করেন নাই। সংসারে ধর্ম্মভাবে থাকিতে পারিলে সংসারের তুল্য স্থান আর নাই।

বিবাহের পর আট বৎসর অতীত হইয়াছে, মনমোহন গোবিন্দপুরের বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া এখন কলিকাতায় কোন স্কুলে অধ্যাপনা করিয়া এবং ২।৩টী গৃহের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কালে তাহাদের সেই সুখের সংসারে একটী সুখের ফুল ফুটিল। কমলার একটী পুত্র সন্তান হইল। মনমোহনের তখন অর্থের তাদৃশ অপ্রতুলতা ছিল না। পিতামাতাকে কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা দ্বারা তাহাদের রোগ কথঞ্চিৎ আরোগ্য করাইয়াছেন। পুত্রের গুণে নিত্যানন্দ ও বিন্দুবাসিনী সংসারে পুনরায় সকল সুখে সুখী হইলেন। মনমোহন প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতার পূজা করিয়া ধন্য হইল। সংসার—প্রবেশের পথে ধর্ম্মই সকলের একমাত্র লক্ষ্যস্থানীয়; ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিলে ঘোর দুঃখের সংসারও সুখের হইয়া থাকে।

একটি চিত্র ।

একটি চিত্র।

(১)

নবীনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে লেখা পড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে। সংসারে তাঁহার বৃদ্ধা জননী মাতঙ্গিনী; স্ত্রী বিমলা, দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও একটী ভগ্নী। আজকাল এত বড় একটী সংসার প্রতিপালন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ আজকাল চাকুরীর বাজার যেরূপ মহার্ঘ তাহাতে বি, এ পাশ করিয়া ২০৲ ২৫৲ টাকার বেশী উপার্জ্জন হয় না। কাজেই নবীনবাবুর সংসারে কষ্টের একশেষ হইয়াছে। মাতঙ্গিনী সেকালের স্ত্রীলোক, কষ্ট সহ্য করিতে তিনি বিশেষ পারদর্শীনী; অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াও যখন নবীনবাবু সংসারের সঙ্কুলন করিতে পারিতেছেন না; তখন জননী আর কি করিবেন, নীরবে কষ্ট সহ্য করিতেন, তথাপি পুত্রকে একটী দিনের জন্য কোনও কথা বলিতেন না, বরং অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট করিবার জন্য নবীনবাবুকে নিষেধ করিতেন। পুত্রগত-প্রাণা জননীর পুত্রের প্রতি এমনি মমতা। জগতে এমন মমতা, এমন স্নেহ ভালবাসা আর কাহার

নিকট আশা করিতে পারা যায় না! বিমলা আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা হইলেও শ্বশ্রূদেবীর শিক্ষাগুণে তাদৃশ প্রগলভা হইতে পারেন নাই। বিমলা বেশ লেখাপড়া জানিতেন। তাহার রূপও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার রূপ-সাগরে এখন যৌবনের একটানা স্রোত প্রবাহিত হইয়া দেহের সৌন্দর্য্য যে কিরূপ মনোনয়নের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে; তাহা বর্ণনা করা যায় না। বিশেষতঃ এই প্রথম সসত্ত্বা অবস্থায় তাহার রূপ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এ রূপের তুলনা নাই। এই রূপ-সাগরে পড়িয়া শুধু নবীন বাবু কেন সংযমী পুরুষকেও যখন হাবডুবু খাইতে হয়, তখন নবীনবাবু ত কোন ছার? বিমলা একটু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। দুই একখানি গহনা তাহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন না করিলে তাহার মন ভাল থাকিত না। তবে যে তিনি স্বামীকে সে জন্য পীড়ন করিতেন, তাহা নহে। আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা হইলেও তিনি স্বামীর মন-কষ্ট দিতেন না; তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতেন। নবীনবাবু স্ত্রীর গুণে সর্ব্বদাই মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন; সাধ্যানুসারে তাহার মনস্তুষ্টি করিতে, তাহার আবদার সহ্য করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। নবীনবাবুর পিতার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর কোনও সরকারী আপিসে কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে অর্থের অনাটন ঘুচিতেছে না দেখিয়া আজ কয়েক বৎসর নিজ বুদ্ধি বলে একটী সামান্য ব্যবসা চালাইয়া বেশ সুখে কাল কাটাইতেছেন। এখন আর তাদৃশ অভাব নাই। নবীনবাবুর সকলেই ধর্ম্মকে সহায় করিয়া সংসারে বেশ শান্তি-সুখানুভব করিতেছেন। পিতা বর্ত্ত-

মাসে কন্যাটীর বিবাহ দিয়াছিলেন। নবীনবাবু এখন ভ্রাতা দুইটীকে শিক্ষা দান করিতেছেন; তাহারাও এই অল্প বয়সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সৎ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। মাতঙ্গিনী পুত্রগণের ও বধূটীর যত্নে বেশ সুখে আছেন। বিমলা শ্বশ্রূদেবীকে বড়ই ভক্তি করেন, মাতঙ্গিনীও তাঁহার এই সসত্ত্বা অবস্থায় সাতিশয় যত্ন করিয়া থাকেন; বধূর যখন যাহা খাইতে বা পরিতে ইচ্ছা হয়, যখন যাহা আবদার করেন, সাধ্যমত তাহা প্রতিপালন করিতে মাতঙ্গিনী ক্রটী করেন না। বিমলা আসন্ন-প্রসবা, মাতঙ্গিনী ভগবানের কৃপায় সকল সুখে সুখিনী হইয়াছেন; একণে দৌহিত্র মুখাবলোকন করিয়া মরিতে পারিলেই তাহার জন্ম সফল হয়। গর্ভাবস্থা নারীজাতির বড়ই সঙ্কট সময়, এজন্য তিনি অহরহ বিমলার নিকট থাকিয়া, যাহাতে প্রসবের সময় কোনও কষ্ট না হয়, যাহাতে বধূ বিনাকষ্টে প্রসব হইতে পারেন, সে বিষয় নানা-প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। এইরূপ রামকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের বংশধরগণ সুখ-স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। এরূপ সুখ শান্তির একত্র সম্মিলন ক্বচিৎ কোনও সংসারে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

(২)

চৈত্র মাস; সামান্য ব্যবসায়ীগণের এই সময় কষ্টের একশেষ হয়। এই সময় টাকার আদান প্রদান করিতে না পারিলে, মহাজনগণকে তাহাদের প্রাপ্য দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কারবারের স্থায়ীত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা। ধনী ব্যবসাদারগণের

কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যাহাদের তাদৃশ মুলধন নাই, কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও গতিকে বুদ্ধির সহিত কারবার চালাইতেছেন, তাহাদের কষ্টের ইয়ত্তা নাই। নবীনবাবু ব্যবসা করিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন বটে কিন্তু তাঁহার তাদৃশ মুলধন নাই। নবীনবাবু ইংরাজী শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবক হইলেও তাঁহার মতিগতি সনাতন ধর্ম্মের প্রতি চিরস্থির বলিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহার মস্তিস্ক বিকৃত হয় নাই বলিয়া, ভগবান তাঁহাকে এই সামান্য ব্যবসায়েই একরূপ আশাতীত ফল প্রদান করিতেছেন। বিগত কয়েক বৎসর তিনি এই সামান্য ব্যবসায়েই বিশেষ ভাগ্যবান হইয়া পিতার ক্রিয়াকলাপ সকল বজায় রাখিয়াছেন। গৃহাদিও বেশ ভদ্রলোকের মত নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু বিগত বৎসর হইতে একটী জুয়াচোরের প্ররোচনায় পড়িয়া অনেক টাকা লোকসান হওয়ায় নবীনবাবু এই আশ্বিনীর সময়ে বড়ই বিব্রতে পড়িয়াছেন। জননী ও স্ত্রীকে তাঁহার এই উপস্থিত বিপদের কথা কিছুই বলেন নাই; তাঁহারা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। চিরহাস্যময়ী, সরল প্রকৃতি বিমলা এখনও আনন্দময়ী; এখনও তিনি হাসিতে হাসিতে স্বামীর নিকট কত আবদার করেন। নবীনবাবু এই চিরানন্দময়ীর আনন্দস্রোতে বাধা দিতে প্রাণে আঘাত পান বলিয়া কিছু বলেন না। কিন্তু আজ তাঁহার মন যেন একটু ভার ভার। প্রাতঃকালে গৃহিণীর সহিত বচসা হইয়াছে; স্পষ্ট ঝগড়া নহে, সেই দুটী-প্রাণে এক প্রাণের ভিতর কলহ হইতে পারে না, তবে সামান্য মনান্তর মাত্র। মহাজনগণের তাড়নায় তাহার মন ত পুর্ব্ব হইতেই

খারাপ হইয়াছে ; কি করিবেন, কি হইবে ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই ত চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন, তাহার উপর সকালে স্ত্রীর সহিত একটী সামান্য বিষয় লইয়া বচসা হইয়াছে। এই জন্য তাহার মনে আজ কিছুমাত্র সুখ নাই; মন বড়ই ভার ভার। বহির্বাটীর একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া মুহু মুহু তাম্রকূট সেবন করতঃ চিন্তা-স্রোতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু যে চিন্তা হৃদয়ের ভিতর একবার প্রগাঢ়রূপে আধিপত্য বিস্তার করিতে পরিয়াছে, সামান্য তাম্রকূট সেবন-জনিত মাদকতায় তাহার কি হইবে? নবীনবাবুর ললাটপটের শিরাকুঞ্চন ও প্রফুল্ল বদন-সরোজের বিষাদমাখা ভাব দেখিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হইবে যে চিন্তা-রাক্ষসী তাহাকে ভীষণরূপে যাতনা প্রদান করিতেছে। মুখই হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ, মুখ দেখিয়া নবীনবাবুর হৃদয় বেদনা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি আজ স্ত্রীর সহিত মনান্তর করিয়া কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

এদিকে রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া নবীনবাবু ধীরে ধীরে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। পাঠক! আপনারা যদি ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আসুন, আমরা এই সময়ে একবার তাঁহার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করি।

(৩)

নবীনবাবু প্রত্যহ রজনীযোগে আহারাদির পর কারবার সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার কার্য্য করিতেন কিন্তু আজ আহারাদির পর তাঁহার আর কোনও কাজ করিতে ইচ্ছা হইল না। নানা

প্রকার দুশ্চিন্তায় শরীর অবসন্ন হইয়াছে, কাজেই আহারাদির পর শয্যায় শয়ন করিলেন। বিমলা কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামীকে শয়ন করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া নানা কথায় স্বামীর মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। বিমলা স্বামীর দুশ্চিন্তার বিষয়, তাঁহার কারবার সম্বন্ধীয় গোলযোগের বিষয় কিছুই জানিতেন না। অন্যান্য দিনের ন্যায় স্বামীর পদসেবা করিতে লাগিলেন। নবীনবাবু আসন্ন-প্রসবা পত্নীকে বেশী রাত্রি জাগরণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন —"রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি ঘুমাইবার চেষ্টা কর, নতুবা অসুখ হইবে।" বিমলা এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই; এক্ষণে স্বামীকে কথা কহিতে দেখিয়া আবদারের সহিত বলিলেন— "তুমি যে কথা কহিলে তাই ভাল। সকাল বেলা একটী জিনিস চাহিয়াছি বলিয়া কি এত রাগ করিতে হয়; দেখ আমি তোমার কাছে কখন কোন জিনিস চাহি না; এবার কিন্তু আমার ঐ জিনিসটী চাই, মুখ ভার করলে চল্‌বে না?" নবীনবাবুর চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল, তিনি প্রণয়িণীর মুখের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাতায়ন-প্রবিষ্ট চন্দ্রালোকে দেখা গেল যে সে হাসিতে আনন্দের কোন চিহ্ন নাই, তাহাতে একটুও মধুরতা নাই, অগত্যা দায়ে পড়িয়া হাসিতে হইলে তাহা যেমন নীরস, কষ্ট-হাসি বলিয়া বোধ হয়; এ হাসি সেই প্রকারের, ইহা কান্নার রূপান্তর বলিলেও বলা যাইতে পারে।

বিমলা স্বামীর মনোভাব কিছু বুঝিতে পারেন নাই, অথবা তাঁহার এরূপ মনোভাব দেখিয়া বলিলেন—আজ সকাল থেকে

এমনি মুখ ভার করেছ, যেন তোমার কি ভয়ানক বিপৎপাত হইয়াছে, দেখ মিত্তিরদের বড়বৌয়ের সাধের সময় কেমন কুড়ি ভরির রতনচুর হইয়াছে, আর আমি তোমার নিকট কখন কোনও জিনিস চাই নাই; আমার এই প্রথম সাধের সময় এক ছড়া চন্দ্রহার চেয়েছি, ইহাতেই তুমি অকুল পাথার ভাবচো তোমার মত কৃপণ পুরুষ ত কখন দেখিনি।

রমনী সদাই বিলাসপ্রিয়; ভূষণপ্রিয় অঙ্গনাগণ ভূষণের জন্য স্বামীর নিকট আবদার করিয়াই থাকে ইহা তাহাদের মধ্যে একটী স্বভাব-সিদ্ধ, সংক্রামক রোগ বিশেষ; মিত্তিদের বড়বৌয়ের হইয়াছে, তিনিও স্বামীকে দিয়া এবার একখানি গহনা লইবেন; এই সাধের সময় তাঁহার মনোসাধ মিটাইবেন। কারণ তিনি জানিতেন তাঁহার স্বামী ত [illegible] অক্ষম নহেন, স্বামীও তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তবে এখন একখানি অলঙ্কার চাহিতে দোষ কি?

বিমলা যুবতী, রূপের তরঙ্গের এখন ভাটা পড়ে নাই; তাহার উপর নূতন গর্ভ সঞ্চার হইয়া রূপের জ্যোতি শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। গর্ভ সঞ্চার হইলে স্বভাবতঃই রমনীজাতির অনেক প্রকার সাধ হয় এবং তাহার এই সাধ মিটাইবার জন্য স্বামী মহাশয় শাস্ত্র সঙ্গত দায়ী, এইজন্য আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে গর্ভ-সঞ্চারের পর সাধ দিবার একটা নিয়ম আছে। নবীনবাবু স্ত্রীর কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা! আন্দাজ কত টাকা পড়িবে?" বিমলা বলিলেন—"কত আর পড়িবে, হদ্দ না হয় দুশো টাকা হউক?"

নবীনবাবু টাকার কথা শুনিয়া ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"আচ্ছা! এখনও ত সময় আছে। চেষ্টা দেখিব।" এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া নিদ্রা যাইবার ভান করিলেন। বিমলাও স্বামীকে তদবস্থায় দেখিয়া আর কোনও কথা না কহিয়া স্বামীর পার্শ্বে নিদ্রিতা হইলেন। বলা বাহুল্য যে বেচারা নবীনবাবু সে রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। নানা দুশ্চিন্তার কঠোর দংশনে সে রাত্রি অমনি কাটিয়া গেল।

(৪)

নবীনবাবু প্রাতঃকালে পুনরায় বহির্বাটীতে আসিয়া বসিলেন, চিন্তা যার সহচরী তাহার কিছুতে সুখ নাই। নবীনবাবু গৃহের এটা সেটা নাড়িলেন, নাড়িতে নাড়িতে একটী কাঁচের গ্লাস ও একটী চিমনী ভাঙ্গিয়া গেল। এরূপে বেলা প্রায় ন'টা হইল; এমন সময় ডাক হরকরা আসিয়া তাহাকে দুইখানি পত্র প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। নবীনবাবু প্রথম পত্রখানি পাঠ করিয়া একবারে বসিয়া পড়িলেন; সে পত্র খানিতে টাকার দায় তাহার নামে ছোট আদালতে একটী গুরুতর অভিযোগ হইয়াছে জানিতে পারিলেন! আর একখানি পত্র তাঁহার বন্ধুর নিকট হইতে আসিয়াছে। তাহাতে বন্ধুটী লিখিয়াছে "যদি ব্যবসায় কোন সুবিধা করিতে না পার, যদি দেনার দায়ে তোমাকে এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় তাহা হইলে পত্র পাঠ আসামে আমার নিকট চলিয়া আসিবে এখানে তোমার একটী ভাল চাকুরী হইতে পারে; নবীনবাবু দুই তিন দিন মধ্যে কলিকাতা হইতে সুদূর

আসাম প্রদেশে পলায়ন করিবেন ; ইহাই স্থির করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং আহারে না বসিলে জননী ও স্ত্রীর আহার হইবে না, বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছা স্বত্তে একবার নাম-মাত্র আহারে বসিলেন। মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবীন! এ কয়দিন যে তুমি কিছুই খাইতে পারিতেছ না।" জননীর কথা শুনিয়া নবীনবাবু বলিলেন—"মা! এ কয়দিন আমার শরীর বড় ভাল নাই।" এই বলিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া বাটীর বাহির হইলেন। অতিরিক্ত চিন্তায় মানব-মন উদাস হইয়া যায় ; কোনও কথাই মনে থাকে না। বাটীর বাহির হইবার সময় পত্র দুইখানির কথা আদৌ মনে পড়িল না। পত্র দুইখানি শয্যার উপর ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি গৃহবহি-গমন করিলেন।

(৫)

বিমলা মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যার উপর দুইখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে পত্র দুইখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তিনি বেশ বাঙ্গালা জানিতেন, পত্র দুইখানি পাঠ করিতে তাঁহার আগ্রহ হইল, হাতে তুলিয়া লইলেন। একবার মনে করিলেন —তাঁহার পত্র আমার কি পড়া উচিত, পরক্ষণেই মনে হইল—তাহাতে ক্ষতি কি ? নির্মল চরিত্র স্বামীর পত্র স্ত্রী পাঠ করিবে, তাহাতে আর ক্ষতি কি ? এই বলিয়া পত্র দুইখানিই আদ্যোপান্ত পাঠ করতঃ যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল ; স্বামীর নিকট অলঙ্কার প্রার্থনার কথা তাঁহার মনোমধ্যে

জাগরিত হইয়া তাঁহাকে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আর দাঁড়াইতে না পারিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ংক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—হায়! হতভাগিনী আমি কি করিয়াছি; তাঁহার এই বিপদপাতের সময়, তাঁহার এই ভয়ানক দুর্ঘটনার সময়, আমি তাঁহাকে অলঙ্কারের কথা বলিয়া না জানি কতই মন-কষ্ট দিয়াছি। তিনি আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন বলিয়া এত দুঃসময়েও "অলঙ্কার দিতে পারিব না" বলিয়া একদিনের জন্যও মন-কষ্ট দেন নাই; আর আমি এ কি করিয়াছি। না জানিয়া তাঁহার এই কষ্টের সময় কত মর্ম্ম-পীড়ায় পীড়িত করিয়াছি। ধিক আমাকে, ধিক আমার অলঙ্কার পরিধানে; স্বামীর তুল্য ভূষণ রমণীজাতির আর ত্রিজগতে কি আছে! আমি সেই অমূল্য-ভূষণকে তুচ্ছ করিয়া, সেই ইহ ও পরকালের একমাত্র দেবতা স্বামীকে অবহেলা করিয়া, ছার অলঙ্কারের জন্য তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়াছি? যাহা হউক আজ সেই সমস্ত স্বামীর মর্ম্ম-পীড়াদায়ক অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া আমার গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব —স্বামীর দেনা পরিশোধ করিয়া দিব আর না বুঝিয়া কদাচ তাঁহার নিকট অলঙ্কারের প্রার্থনা করিব না এবং ঋণ পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাতে পুনরায় তাঁহার ব্যবসায় উন্নতির জন্য মূলধন স্বরূপ প্রদান করিব। তথাপি অভাগিনীর ধনকে দেশান্তরে যাইতে দিব না। এই বলিয়া তিনি দাসীর ~~দ্বারা~~ ন' কর্ত্তাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। পাঠক! হয় ত মনে

করিতে পারেন, পূর্ব্বপ্রদত্ত অলঙ্কারের দ্বারা ত আর স্বামীর মর্ম্ম-পীড়া উৎপাদিত হয় নাই, তবে এ সকল বিক্রয়ের কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, পত্রে স্বামীর ঋণদায়ে জড়ীভূত হইবার কথা এবং সেই হেতু দেশান্তর পলায়নের কথা পাঠ করিয়া তিনি সমস্ত অলঙ্কারের প্রতিই বীতশ্রদ্ধা হইয়াছিলেন। ন' কর্ত্তা পার্শ্বস্থিত গ্রামের মালিক, তাঁহার পিতার পরম বন্ধু; এমন কি বাল্যকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর তিনি ন' কর্ত্তার দ্বারাই এক প্রকার মানুষ হইয়াছেন। এইজন্য বিমলার নিকট যাইতে তাঁহার কোনও বাধা ছিল না। তিনি বরাবর বিমলার গৃহে গমন করিয়া বলিলেন—"বিমলা আমাকে কেন ডেকে ছিলে?"

বিমলা ন' কর্ত্তাকে জেঠা বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তিনি যেরূপে স্বামীর মন-কষ্ট দিয়া অশেষবিধ পাপ সঞ্চয় করিয়াছেন—তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। ন' কর্ত্তা বিমলার প্রগাঢ় পতিভক্তি দেখিয়া শতমুখে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এবং অলঙ্কারগুলি লইয়া বিক্রয় করিতে আসিলেন। বিমলা সমস্ত গহনাগুলি বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন; কেবল দুইগাছি সুবর্ণ বলয় রক্ষা করিয়া, সমস্ত বিক্রয় করিবার জন্য ন' কর্ত্তাকে দিয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ন' কর্ত্তা দুই হাজার টাকা আনিয়া দিলেন। বিমলা বলিলেন—জেঠা মহাশয়! আপনি শ্রীধর বেনের ৫০০৲ টাকা ও রামধন দোকানির পাওনা ২০০৲ টাকা পরিশোধ করিয়া দুই খানি রসিদ লইয়া আমাকে দিন; নতুবা কিছুতেই আমার

মন স্থির হইতেছে না। নকর্ত্তা তাহাই করিলেন। বৈকালে দেনা পরিশোধ করিয়া দুইখানি রসিদ আনিয়া বিমলার হস্তে দিলেন। এবং বলিয়া গেলেন, আর কোনও চিন্তা নাই, তাহারা বলিয়াছে, কল্যই মোকদ্দমা তুলিয়া লইবে। বলা বাহুল্য যে অলঙ্কার বিক্রয়ের কথা নকর্ত্তা ও বিমলা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিল না।

(৬)

রাত্রি অনেক হইয়াছে। এখনও স্বামী গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন না। বিমলা মহা ভাবনায় পড়িলেন; শয্যাতলে বসিয়া কেবল মধুসূদনের নাম করিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিলেন। সতী বিমলার এ ক্রন্দন বোধ হয় ভগবানের কর্ণে পঁহুছিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১২ টার সময় তাঁহার স্বামী ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রফুল্ল মুখে গৃহে আসিলেন। এতক্ষণ বিমলা যেন শূন্য প্রাণে মৃতের ন্যায় পড়িয়াছিলেন; এইবার তাঁহার জীবনের জীবনকে গৃহ-প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহার দেহে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বামীকে পা ধুইবার জল দিলেন; জলখাবার দান করিয়া স্বহস্তে তামাক সাজিয়া দিলেন। নবীনবাবু সমস্ত দিনের পর জলযোগ করিয়া একটু সুস্থ হইয়া নিমীলিত চক্ষে তামাক টানিতে লাগিলেন। এইবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বিমলা ছল ছল নেত্রে তাহার নিকট গমন করিয়া রসিদ দুইখানি প্রদান করিয়া একধারে অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া নতাননে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন, নবীন-বাবু ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ দুইখানি পাইয়া আগ্রহ সহকারে আলোর

নিকট পাঠ করিয়া প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, পরে বিমলার প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত ও মোহিত হইলেন; স্ত্রীকে নিকটে লইয়া তাহার রক্তিমাভ গণ্ডে একটী আনন্দ-চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইলেন, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী কর্ত্তৃক ঋণ পরিশোধ হইয়াছে দেখিয়া নবীনবাবু যে কিরূপ আনন্দানুভব করিলেন তাহা বর্ণনাতীত।

নবীনবাবু স্ত্রীর অসামান্য চরিত্র ও ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া বিস্মিত ও আহ্লাদে গদগদ হইলেন এবং মনে মনে কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়। এমন স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিলাম না, আমার জীবনে ধিক্, এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

গৃহিণী স্বামীর এইরূপ বিলাপ দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। নিজ অঞ্চলে তাঁহার প্রাণাধিকের নেত্রজল মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নবীনবাবুর মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানিল না, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যেরূপে পারি আবার তোমার সোণার অঙ্গ সাজাইব, নতুবা আর গৃহে আসিব না। বিমলা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—আমি তোমার অবস্থা না বুঝিয়া এরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমায় ক্ষমা কর; তুমিই আমার অঙ্গের ভূষণ, মাথার মণি; আমার অন্য ভূষণে আর প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, কম্পিত হস্তে স্বামীর পদ-ধূলি জিহ্বায় লেহন করিয়া মস্তকে প্রদান করিলেন। সেই অবধি স্ত্রীপুরুষে অবস্থার বশীভূত হইয়া আন্তরিক সন্তোষ সহ-

কারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কালে বিমলার একটী পুত্র সন্তান হইল। অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া তাঁহারা পার্থিব ধনরত্নের চিন্তা ভুলিয়া ধর্ম্মভাবে সংসার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নবীনবাবু স্ত্রী-প্রদত্ত মূলধন লইয়া পুনরায় ব্যবসার উন্নতি করিলেন।

যে পবিত্র হিন্দুর গৃহে এরূপ আদর্শ নারী-চরিত্রের পূত চিত্র সতত চিত্রিত, তাহা ত স্বর্গের বিমল বিভায় বিভাবিত, তাহাই ত স্বর্গ। এ অতুলনীয় চিত্র হিন্দুর গৃহ ভিন্ন আর কোনও গৃহে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

কন্যাদায় ।

কন্যাদায়।

(১)

জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মানুষকে সময়ে সময়ে নানা-প্রকার দায়ে ঠেকিতে হয়। দায়ের হস্তে পতিত হইয়া ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইতে হয় নাই, এমন লোক জগতে অতি বিরল। সামান্য দীন দরিদ্র হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত সকলকেই এক বার না একবার হয় পিতৃদায়, না হয় মাতৃদায় অথবা কন্যা-দায়ে ঠেকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। পিতৃ, মাতৃ ও কন্যাদায় এই ত্রিবিধ দায়ের মধ্যে শেষোক্ত দায়ই বর্ত্তমান কালে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। অর্থ থাকিলে সকল দায় হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই ধনের সংসারে ধনের দ্বারা সংশোধিত হয় না, এমন কার্য্য নাই। কিন্তু কন্যাদায়ে তুমি যতই কেন অর্থব্যয় কর না, লাঞ্ছনাভোগ অনিবার্য্য ইহা সহ্য করিতেই হইবে। যাহার অর্থ নাই—পিতামাতার মৃত্যুর পর কেবল রোদনমাত্র সার করিয়া, অকৃতি পুত্র সে দায় হইতে অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে সনাতন আর্য্যশাস্ত্রে আমাদের এরূপ ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু কন্যাদায় উপস্থিত হইলে, অধুনা যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া

বড়ই কঠিন ব্যাপার, এক্ষণে সামান্য পাত্রে কন্যাদান করিতে হইলেও পিতামাতাকে প্রমাদ গণিতে হয়। শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন পাত্রের ত কথাই নাই, দরিদ্রের এমন সাধ্য নাই যে তাহার নিকট অগ্রসর হয়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যাহারা বহুকষ্টে সংসার প্রতিপালন করেন, সামান্য আয়ে যাহাদিগকে সংসার পরিচালন করিতে হয়, তাহাদিগকে একমাত্র কন্যাদায়ে ঠেকিতে হইলেই চারিদিক অন্ধকার! এরূপ কত শত দৃষ্টান্ত যে আমরা প্রতিনিয়ত চক্ষের সম্মুখে দর্শন করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। হায়! বঙ্গসমাজ আজ অর্থের জন্য কি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেই অভ্যস্থ হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাঞ্চনপুর গ্রামে ভজহরি বন্দোপাধ্যায় যাজনক্রিয়ার দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, সম্প্রতি তিনি যমুনানাম্নী একমাত্র কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী সামান্য চাষ বাসের আয়ে কন্যাটীকে লইয়া বহুকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে যমুনা বড় হইতে লাগিল; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপের জ্যোতি পূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(২)

কাঞ্চনপুর গ্রামে অনেক বড় বড় লোকের বাস। ভজহরির বাটীর নিকটে বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাস, তিনি কলিকাতায় দালালীর কার্য্য করিয়া বেশ সম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া নিজগ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। পল্লীগ্রামে দুই তিন শত টাকার

মাসিক আয় হইলে তাহার প্রভাব, তাহার প্রতিপত্তি সহজেই বিবেচ্য। বীরেশ্বরকে পাড়ার সকলেই মান্য করিত, গ্রামে কোন কার্য্য কর্ম্ম হইলে, কোনও মালি মোকদ্দামা হইলে বীরেশ্বরকে সকলেই মধ্যস্থ মানিত, বীরেশ্বর নিজের বুদ্ধি অনুসারে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন, সে মীমাংসার আর কোনও প্রতিবাদ চলিত না, বীরেশ্বরবাবু যাহা করিবেন তাহাতে ভিন্নমত করে কার সাধ্য। শুনিতে পাওয়া যায় কলিকাতায় অবস্থানকালীন বীরেশ্বরবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিতেন, তিনি প্রায়ই কাঞ্চনপুরে আসিতেন না, বাটীতে মাতা, পুত্র, পত্নী এবং বিধবা ভগ্নীর জন্য কিছু কিছু খরচ পাঠাইতেন মাত্র। বাটীতে না আসাতেই সকলেই তাঁহার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিত কিন্তু এক্ষণে তিনি দেশে আসিয়াছেন তাঁহার অর্থ হইয়াছে, এখন তাহার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করে কার সাধ্য,—অর্থ থাকিলে যে সমস্ত দোষ ঢাকিয়া যায়, অথবা দোষ থাকিলেও কেহ তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারে না। অর্থের এতই প্রভাব! এখন বৃদ্ধ বয়সে তিনি তপস্বীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অর্থও যথেষ্ট ছিল বলিয়া পূর্ব্বদোষ কেহ ধরিত না। বীরেশ্বরবাবুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর সহিত যমুনার মাতা বিন্দুবাসিনীর বড়ই সদ্ভাব ছিল। এইজন্য বীরেশ্বরবাবুর পুত্র ললিতমোহনের সহিত যমুনার বড় ভাব হইয়াছিল, তাহারা সদা সর্ব্বদাই একত্রে খেলা করিত আহার করিত, বেড়াইত। যমুনা শৈশবে পিতৃহীনা বলিয়া জাহ্নবীদেবী তাহাকে বড়ই যত্ন করিতেন। বালক-বালিকা

আঁদর পাইলে প্রায় কাছছাড়া হইতে চাহে না! এই জন্যই যমুনা সদাসর্ব্বদা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে থাকিত। বিশেষতঃ ললিতমোহন যমুনাকে বড়ই ভাল বাসিত তাহাকে একদণ্ড না দেখিলে দিশাহারা হইত। ললিতমোহন গ্রাম্য বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিত, স্কুলের ছুটীর পর বাটীতে আসিয়া একত্রে যমুনার সহিত খেলা করিত, পরে সন্ধ্যা হইলে যমুনা কেবল মাত্র বাটীতে আহার করিয়া পুনরায় ললিতের কাছে আসিত, ললিত আহারাদির পর পাঠ অভ্যাস করিতে বসিত, যমুনা তাহার কাছে বসিয়া এটা ওটা নাড়িত, পেন্সিল লইয়া আপন মনে খাতায় কত কি লিখিত, এখন যমুনার বয়স সাত বৎসর, ললিতের বয়স দ্বাদশ বৎসর। ললিত বেশ মেধাশক্তি সম্পন্ন ছিল, ক্রমে সে গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে সুখ্যাতির সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। জাহ্নবী ও বীরেশ্বরের আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্র শিক্ষিত হইলে কোন্ পিতামাতার না আনন্দ হয়? জাহ্নবী-দেবী পুত্রের উন্নতির জন্য কত পূজাদি প্রদান করিলেন, কয়দিন তাহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। বিন্দু-বাসিনীও এ আনন্দ সংবাদে যারপরনাই আনন্দ অনুভব করি-লেন। আর আনন্দ হইল যমুনার, সে যদিও অত শত কিছুই ভাল বুঝিতে পারিল না, তথাপি সে প্রাণের ললিতের সুখ্যাতি শুনিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ লাভ করিল।

(৩)

গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হইল। বীরেশ্বরবাবু পুত্রকে কলিকাতায় পড়াইবার মনস্থ করিলেন কিন্তু জাহ্নবীদেবী ইহাতে

বড়ই নারাজ, পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইতে তাহার আদৌ ইচ্ছা নাই, তাহার মতে ললিত যাহা শিখিয়াছে তাহাই যথেষ্ট তাহাকে ত আর রোজগার করিয়া খাইতে হইবে না। বিশেষতঃ তিনি একমাত্র নয়নের মণি, প্রাণের আনন্দ, হৃদয়াকাশের ধ্রুবতারা ললিতকে দূরদেশে পাঠাইয়া কেমন করিয়া থাকিবেন? কিন্তু কি করিবেন স্বামীর অমতে ত হিন্দুরমণী কোনও কার্য্য করিতে পারেন না, অবশেষে পুত্রকে কলিকাতায় লেখাপড়া শেখানই স্থির হইল। বীরেশ্বরবাবু গৃহিণীকে অনেক বুঝাইয়া শুভদিনে পুত্রকে লইয়া শ্যামবাজারে তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যালকের নিকট রাখিয়া লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ললিতমোহন মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল। ললিত কলিকাতায় গমন করিলে পর যমুনার সহিত দেখা সাক্ষাৎ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। যমুনা এখন মুখুর্য্যেদের বাটী প্রায় যায় না, বাটীতে থাকিয়া মাতার কাজ কর্ম্মের সহায়তা করে, এবং সময় পাইলে নির্জ্জনে বসিয়া কেবল ললিতের চিন্তা করিয়া থাকে; ক্রমে ক্রমে ফুল্ল-কুসুমে কীট প্রবেশ করিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয় যমুনার সেই দশা হইতে লাগিল। ললিত যে একেবারে যমুনার চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহা নহে, তবে পল্লীগ্রামের বালক আজব সহর কলিকাতায় আসিয়া, কলিকাতা নগরীর শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া এক প্রকার চিত্ত স্থির করিতে পারিয়াছিল, মনে করিয়াছিল কলিকাতায় পাঠ শেষ করিয়া দেশে গিয়া পুনরায় যমুনাকে দেখিয়া সুদীর্ঘ প্রবাসের কষ্ট বিস্মৃত

হইব। কাঞ্চনপুরে এই দুইটী শিশুর শৈশব-সুখ বহুদিন হইতে প্রগাঢ় হইতেছিল। যে দেখিত, সেই সুখী হইত, কেবল হইত না একজন। সে অলক্ষ্যে তীব্র হাসি হাসিত, তাহাকে তোমরা যতই কেন ভাল বল না, যতই কেন তাহার দয়ামায়ার কথার ব্যাখা করনা, আমরা কিন্তু তাহাকে দয়াময় বলিতে পারিব না; তিনি নিষ্ঠুর, অতীব নিষ্ঠুর। মানুষ যাহা মনে করে তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া দেন। এ বিশ্বসংসারে তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তিনি যে খেলা খেলিবেন তাহা করা ত্রিজগতে কাহার সাধ্য নাই। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সে খেলুবাড়ের মায়া খেলায় অভিভূত; আমরা ক্ষুদ্র জীব, সেই ধারণাতীত বিধাতার লীলা কি বুঝিব? আজ সেই লীলাময়ের লীলায় প্রণয়ীযুগল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া অশেষ যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিল।

(৪)

বীরেশ্বরবাবু পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া বাটীতে আসিলেন। পুত্রগত-প্রাণা মাতা পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বীরেশ্বরবাবু বলিলেন—"ললিত বেশ সাধনের সঙ্গে আহার বিহার করিতেছে, লেখাপড়া করিতেছে, তাহার তথায় থাকিবার কোনও অসুবিধা হইবে না।" বলা বাহুল্য যে সাধন তাঁহার শ্যালক পুত্রের নাম, ললিতের সমবয়স্ক।

জাহ্নবীদেবী বলিলেন, দাদাকে বেশ ভাল করিয়া বুলিয়া আসিলে ত?

বীরেশ্বরবাবু বলিলেন, সে বিষয় আর তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছি।

আহারাদি করিতে রাত্রি অধিক হইল। বীরেশ্বরবাবু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শয়ন করিলে, জাহ্নবীদেবী তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে বিন্দুবাসিনী কথিত ললিতের বিবাহ-সংক্রান্ত কথার উত্থাপন করিলেন। বীরেশ্বরবাবু বড়ই লোভী অর্থের আশা তাহার কিছুতেই মিটে না, এত টাকার অধিপতি হইয়াও ভজহরির বিষয়টুকুর জন্য তাহার বড়ই লোভ ছিল, আর তাহার বিষয়টুকু সামান্য হইলেও ভজহরির ভদ্রাসন বাটী ও তৎসংক্রান্ত বিস্তৃত জমী বীরেশ্বরবাবুর বাটীর সংলগ্ন, কোনও রূপে তাহা হস্তগত করিতে পারিলে তাঁহার নব-নির্ম্মিত অট্টালিকার কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়, এইজন্য তাহার বহুদিন হইতে লোভ ছিল, কিন্তু এক্ষণে পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে তাহার লেখাপড়া হইবে না। লেখাপড়া না শিখিয়া প্রথমে তিনি বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন, এক্ষণে না হয় কোনও বন্ধুর কৃপায় এবং তাহার ভাগ্যক্রমে দুই পয়সা রোজগার করিতেছেন, কিন্তু ভাগ্য ত চিরকাল সুপ্রসন্ন থাকে না। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহার ত থাকিবার কোনও নিশ্চয়তা নাই, অতএব এখন বিবাহ দিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা উচিত নহে, এই ভাবিয়া বলিলেন, দেখ, তুমি যমুনার মাতাকে বলিও যে, তাহাতে আর ক্ষতি কি, এখন উভয়ে ছেলেমানুষ বিবাহের উপযুক্ত হইলে অবশ্যই বিবাহ দিব, এখন দুই চার বৎসর যাক, ললিতের আরও একটু লেখাপড়া হ'ক। বীরেশ্বর ভজহরির পত্নীকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া রাখিলেন।

বিন্দুবাসিনীর আর অভিভাবক নাই। দুই তিনখানি গ্রামান্তরে তাঁহার পিত্রালয়; তথায় তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ ও কয়েকটী পুত্র, ভ্রাতার অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে, যে সদাসর্ব্বদা ভগ্নীর নিকট থাকিয়া তাঁহার কষ্ট দূর করেন। আর বিন্দুবাসিনী জানিতেন যখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আশ্বাস দিয়াছেন, তখন কি, তাহার কথা মিথ্যা হইতে পারে। এইজন্য তিনি কন্যার বিবাহের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। আর ললিতের সহিত বিবাহ দিবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা; কোন পিতামাতা কন্যার বিবাহ সর্ব্ববিষয়ে সদ্গুণশালী পাত্রে দিতে না ইচ্ছা করেন, অবস্থা ভাল হইলে এ বিষয়ে অর্থের মায়া কেহই করেন না। বিন্দুবাসিনী সর্ব্বস্ব দিয়াও ললিতের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। কারণ ললিত ও যমুনা দুইটীতে যেন মানিক যোড়, এ দুইটী এক সূত্রে গ্রথিত হইলে, বেশ সুখী হইবে, বিশেষতঃ ইহারা উভয়েই উভয়ের অনুরূপ, বিধাতা যেন একত্রে রাখিবার জন্যই প্রথম হইতে ইহাদিগকে একত্র মিলিত করিয়াছেন। বিন্দুবাসিনী কন্যার বিষয় চিন্তা করিয়া আর কোনও পাত্রের অনুসন্ধান করিলেন না। মৃত ভজহরি বাবু বীরেশ্বরবাবু অপেক্ষা জাত্যাংশে অনেক শ্রেষ্ঠ হইলেও বিন্দুবাসিনী কন্যার সুখের জন্য সে বিষয় লক্ষ করিলেন না। ভাবিলেন আমার ত আর কেহই নাই যে এ কার্য্যের জন্য তাহার বিবাহে কষ্ট পাইতে হইবে। যমুনাই আমার সব, যাহাতে সে সুখিনী হয় তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিন্দুবাসিনী

ললিতের সহিতই যমুনার বিবাহ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাতে বীরেশ্বরবাবু ও তাঁহার পত্নীরও মত ছিল। এইজন্ত তিনি আপন অগ্রজকে কন্যার বিবাহ-সংক্রান্ত পাত্র স্থির করিবার জন্ত কোনও কথা বলেন নাই; বিন্দুবাসিনীর ভ্রাতাও জানিতেন বীরেশ্বরবাবুর পুত্রের সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে পাড়ার সকলেও জানিত ললিত যমুনার বর, যমুনা ললিতের ক'নে কিন্তু হইলে কি হয়, বাল্য-প্রণয়ে যে বিধাতার চির অভিশাপ আছে। অর্থলোভী পিশাচের কথায় বিশ্বাস করিয়া কে কবে সফল কাম হইয়াছে?

(৬)

ললিতমোহন কলিকাতায় থাকিয়া মাতুলের যত্নে বেশ লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। ললিত কিয়দ্দিনের মধ্যেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এফ, এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এখন ক্রমশঃ দুই এক স্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিছু মোটা টাকা পাইবার আশাও হইতে লাগিল। বিন্দুবাসিনী এখন জাহ্নবীকে দিয়া পূর্ব্বের কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের মত কথা শুনিতে পাইলেন না। বিন্দুবাসিনী আর আর কথায় তাদৃশ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া এক দিবস জাহ্নবীকে হাতে ধরিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে বলিলেন। জাহ্নবীদেবী কি করেন স্বামীর মনোগত ইচ্ছা সমস্ত ব্যক্ত করিলেন; শুনিয়া বিন্দুবাসিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। যমুনাকে আর বেশী দিন অবিবাহিতা রাখা যায় না—তাঁহার তাদৃশ অভিভাবক কেহ নাই

যে সত্বর কোন পাত্র স্থির করিয়া দেন। আর যমুনা ললিতের সদ্ভাব দেখিয়া আর তাঁহারও অন্যপাত্রে সমর্পণ করিতে প্রাণে যেন কিরূপ আঘাত লাগিল। সরলপ্রাণা বিন্দুবাসিনী কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আজ মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি জানিতেন ভদ্রলোকের কথা ও কাজ একই কিন্তু আজ তাঁহার অদৃষ্টগুণে বিপরীত ভাব ধারণ করিল। বিন্দুবাসিনী বলিলেন দিদি! আর কেন আমাকে চিন্তানলে দগ্ধ কর, তোমরা দয়া করিয়া আমার কন্যাটীকে গ্রহণ করিলে আমার মহা উপকার করা হয়; আমাকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিলে ভগবান তোমাদের প্রতি সদয় হইবেন। এই বলিয়া হাতে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জাহ্নবীদেবীর হৃদয় তাহাতে আর্দ্র হইয়াছিল কিন্তু অর্থ-পিশাচ স্বামীর নিকট ত কোন অনুরোধ রক্ষা হইবে না। এই জন্য তিনি বলিলেন—দিদি! আমি কি করিব বল আমি অনেক বুঝাইয়াছি কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। বিন্দুবাসিনীও জানিতেন জাহ্নবীদেবী তাঁহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া স্বামীর মতভেদ করিতে পারেন নাই। শেষে বিন্দুবাসিনী কি করিবেন একমাত্র কন্যার সুখের জন্য আপনার সমস্ত বিষয় জামাতার নামে লিখিয়া দিতে স্বীকৃতা হইলেন। তবে তাঁহার বিষয়ের আয় হইতে তাঁহার জীবদ্দশা অবধি মাসিক দশ টাকা করিয়া দিব। একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন। লেখা পড়া ঠিক হইয়া গেল। ভজহরি জীবিত থাকিলে বোধ হয় তাঁহার কন্যার সহিত বীরেশ্বরের পুত্রের বিবাহ অসম্ভব হইত, উন্নত কুলশীল ভজহরি বোধ হয় এ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি-

তেন না। কিন্তু অর্থহীনা বিন্দুবাসিনী কন্যার ভবিষ্যৎ প্রতি দেখিতে গিয়া নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি যে নিজের জাত্যভিমান ভুলিয়া, নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া এ কার্য্য করিলেন কেহ তাহা দেখিল না, সমাজ তাহার কোনও প্রতিবাদ করিল না নরপিশাচ বীরেশ্বরের হৃদয় সামান্য একজন স্ত্রীলোকের এরূপ ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া একটু বিচলিত হইল না। হায়! অর্থ তুমি মানুষকে এইরূপই মনুষ্যত্ববিহীন করিয়া কেল।

(৭)

পাঠক হয়ত মনে করিতে পারেন এ বিবাহে যমুনার মা বিন্দুবাসিনীর এত জেদ কেন। তাহার একান্ত ইচ্ছা আমার একটী মাত্র কন্যা যাহাতে চিরসুখিনী হয়, যমুনার মাতা তাহার গুণবতী কন্যা যেন সৎপাত্রে পড়ে, এই জন্য তাহার এত জেদ। শেষে বীরেশ্বরবাবু কিছুতেই স্বীকৃত হন না দেখিয়া বিন্দুবাসিনী দশ টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া জামাতাকে সমস্ত বিষয় দানপত্র লিখিয়া দিলেন। বীরেশ্বরবাবু স্ত্রীর দ্বারা যে কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইল দেখিয়া বিবাহ কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভজহরির ভদ্রাসন টুকু হস্তগত করাই বীরেশ্বরবাবুর উদ্দেশ্য। যাহার যত অর্থ তাহার আকাঙ্ক্ষা যে তত বলবতী বীরেশ্বরের কার্য্য কলাপে তাহা বিশেষ প্রতীতি জন্মিবে। একজন অনাথা স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে বীরেশ্বরবাবু কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। সমাজও এ বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ করিল না। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল অমন

একটা বড় ঘরের শিক্ষিত পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে হইলে ইহার কমে কিছুতেই হয় না। বীরেশ্বরবাবু যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে মহৎ লোক না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। অন্যত্রে তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিলে নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইত।

যমুনার রূপ ও গুণও সেইরূপ, রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশে যমুনা দরিদ্রের আঁধার গৃহে উজ্জ্বলতম রত্ন বিশেষ; কিন্তু আমাদের সমাজে এ রত্নের আদর নাই; তাই ধনের বিনিময়ে এই রত্নের আদর হইল। পোড়া সমাজের চক্ষু নাই, তাহাদের বিচার বিবেচনা নাই তাই রত্নগর্ভা বিন্দুবাসিনীর রত্নস্বরূপা কন্যার বিবাহে তাঁহাকে ভবিষ্য-সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল।

(৮)

শুভদিনে ললিতের সহিত যমুনার শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ললিত ও যমুনার বহুদিনের একত্র সম্মিলন আজ অক্ষুণ্ণ হইল। অদৃষ্টদেবতা বিপরীত পরিচালিত না করিয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট পথে লইয়া গেলেন। কিন্তু তাহারা জানিতে পারিলেন না এ বিবাহ কি প্রকারে হইল। যমুনা জানিল যে, তাহার বিবাহে উদরান্নের সম্বলটুকু হারাইলেন। ললিত জানিতে পারিলেন না যে তাহার পিতা কিরূপে একজন অনাথা স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন। কারণ তাহারা এখন বালক এরূপ গুরুতর বিষয়ে তাহাদের আবশ্যক কি? পিতামাতার কর্ত্তব্য কাজ পিতামাতা করেন। ভাগ্যদেবতা তাহাদিগকে সুখী করিলেন এই সুখেই তাহারা সুখী।

যমুনার মাতা বিন্দুবাসিনীও জানিতে পারিলেন তাহার একমাত্র কন্যা ত ভাত কাপড়ে কষ্ট পাইবে না, আর স্বামীসুখেও চির-সুখিনী হইবে। আমি আর কতকাল বাঁচিব, ঐ দশ টাকা মাসিক পাইলেই যথেষ্ট হইবে। বিন্দুবাসিনী এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত মনে করিয়া সুখস্রোতে ভাসিতে লাগিল।

উপসংহার।

যমুনা ও ললিতের বিবাহ ঠিক বয়সে হইল। ললিত কলিকাতায় পড়িতে লাগিল, আর সোহাগ প্রতিপালিতা, লাবণ্যলতা যমুনা মাতার ও শ্বশ্রূর প্রতিপালনে সংবর্দ্ধিতা হইতে লাগিলে সকলে বলিল এ বিবাহ রাজযোটক হইয়াছে, ললিত শান্তশিষ্ট ছেলে পিতার অবাধ্য নয়। হিন্দুর নিয়মানুসারে সে পিতা মাতার মতের উপর মত প্রকাশ করিতে পারে না আর করিলেও তাহা গ্রাহ্য করিবে কে? ললিত ত এখন উপযুক্ত হয় নাই যে পিতার বিষয়ে কি প্রতিবাদ করিবে? বৎসরাবধি বিরেশ্বরবাবু কথামত বেহানকে মাসিক দশ টাকা করিয়া প্রদান করিলেন। এক বৎসর পরে দ্বিরাগমনের দিনস্থির করিয়া বিরেশ্বরবাবু বধূমাতাকে গৃহে আনিলেন। এখন হইতে বিন্দুবাসিনীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একরূপ শেষ হইল। তিনি বুঝিলেন আর ত বিন্দুবাসিনীর কিছু নাই যে গ্রহণ করিব। এখন বেশী ঘনিষ্ঠতা করিলে বরং সময়ে সময়ে কিছু কিছু দিতে হইবে। বিন্দুবাসিনীর সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবদশা পর্য্যন্ত মাসিক ১০

টাকা দেওয়াও বিশ্বেশ্বরের ভার বোধ হইল। হায় বিন্দুবাসিনী ! তুমি নিজ দোষে কি করিতে কি করিয়া ফেলিলে অর্থপিশাচ বিশ্বেশ্বরকে ভাল জানিয়া নিজের অন্নসংস্থান পরের হাতে তুলিয়া দিলে ?

বিন্দুবাসিনী কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া তিনি আপনার ভ্রাতার নিকট আনন্দপুরে চলিয়া গেল। এবং বৈবাহিককে বলিয়া গেলেন তাহার মাসিক ১০৲ টাকা যেন আনন্দপুরে পাঠান হয়। বিশ্বেশ্বর তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। বিন্দুবাসিনীর ভ্রাতার তাদৃশ আয় ছিল না ; তিনি এক প্রকার অনশনে অর্দ্ধাশনে স্ত্রী পুত্র লইয়া কাটাইতেন বৃদ্ধ বয়সে তাহার অন্য কোনও উপায় নাই। তাহার উপর ভগ্নীর ভার পড়িল। বিন্দুবাসিনী তথায় থাকিয়া বৈবাহিককে টাকার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু আর সে পত্রের কোনরূপ উত্তর বা টাকা পাইলেন না এদিকে তাহার বৃদ্ধ ভ্রাতা কিছুদিন পরে পরলোক গমন করিলেন। অভাগিনী বিন্দুবাসিনী ভ্রাতাজায়া ও তদীয় পুত্রগণ সহ ঘোরতর দুঃখার্ণবে নিমজ্জিতা হইলেন। আজ হইতে তাহাদের প্রকৃত অনশন আরম্ভ হইল। পাঠক বিন্দুবাসিনীর এ অনশন কিসের জন্য, কেবল কন্যাদায় কি ইহার একমাত্র কারণ নহে ? তিনি না হয় কন্যার হিতের জন্য বিশ্বেশ্বরবাবুর পুত্রকেই জামাতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায় বিশ্বেশ্বরবাবু অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়া, অর্থের জন্য অনাথা স্ত্রীলোককে অনশনে দিনপাত করাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কেবল পাপ স্বার্থসিদ্ধিই তাহার এত প্রিয় হইল ?

ঐ সকল সমাজও এ সকল অত্যাচার দেখিয়া দেখিল না বরং ধনলোভে বিরেশ্বরের পৃষ্টপোষকতা করিল। যতদিন না সমাজ হইতে পুত্রপণরূপ এই ঘৃণিত বৃত্তি লোপ পাইবে, ততদিন আমাদের বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভ সমস্তই বৃথা। সাং সং।

বঙ্গ-বিধবা
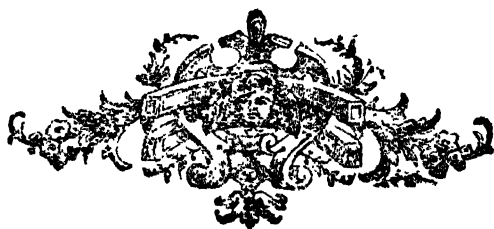
বঙ্গ-বিধবা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ডাকিল—সাড়া দিল না।

মা, মা, মা,—বিজয়া তাহার মুমূর্ষু জননীর বুকের উপর পড়িয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিল,- কিন্তু কোনও উত্তর পাইল না। বালিকা আবার ডাকিল—মা, মা, মা—এবারেও বিজয়া কোনও উত্তর না পাইয়া, রোগে জর্জ্জরিতদেহা কঙ্কালাবশিষ্টা জননীর রোগ-ক্লিষ্টা, কালিমাময় চিবুক ধরিয়া আবার ডাকিল মা, মা, মা,—এবারও কোন উত্তর নাই, জননী নিস্পন্দ, নীরব। বালিকা তিনবার ডাকিবার পর যখন জননীর নিকট হইতে কোনও উত্তর পাইল না, তখন ভাবিল তাহার জননী নিদ্রিতা হইয়াছেন। বিজয়া বালিকা, সংসারিক বিষয়ে এখন তাহার জ্ঞান অতি অল্প, তাই জন্ম মৃত্যু কি, তাহা সে জানে না। এ সংসার যে পান্থ নিবাস ইহার সকলই যে অসার; মানুষ দুদিনের জন্ত এখানে আসে, দিন ফুরাইলেই যে যার স্থানে চলিয়া যায়, দশ বৎসরের বালিকা বিজয়া তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? বিজয়া জানে—যখন সে মা ছাড়া একদণ্ডও থাকিতে পারেনা,

তখন তাহার স্নেহময়ী জননী কোন প্রাণে তাঁহার স্নেহের বিজয়ার নিকট হইতে চির বিদায় লইবেন। তাই সাড়া না পাইয়াও সে ভাবিল তাহার স্নেহময়ী জননী নিদ্রা যাইতেছেন। তখন সে আর তাহার জননীকে বিরক্ত করিল না। নীরব, নিশ্চল, নিস্পন্দভাবে বালিকা জননীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রহিল।

যামিনী প্রায় দ্বিজাম অতিক্রম করিয়াছে। জগত সুষুপ্তির ক্রোড়ে অচেতন। সুধাংশু বিহনে রজনী অন্ধকারময়ী। ক্ষুদ্র খদ্যোতকুল বৃক্ষ পত্রে বসিয়া আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। প্রকৃতি স্থিরা গম্ভীরা, মৃদুমন্দ প্রবাহিত উষা-সমীরণে ঈষদান্দোলিত অসংখ্য বিটপীশ্রেণীর ক্ষণিক মর্ম্মর শব্দে নৈশ নীরবতা আরও গাঢ়তর হইতেছে। কালিমাময় গগনবক্ষে রাত্রি জাগরণে মলিনকান্তি দুই চারিটি নক্ষত্রের অবশপ্রায় নয়ন পল্লব ধীরে ধীরে মুদিত হইতেছে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কালো কালো মেঘখণ্ড গগনগায় বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে; ধরণী বক্ষে তাঁহার মলিন ছায়া নিপতিত হইয়া প্রকৃতির মলিনতা আরও ঘণীভূত করিতেছে। এই গভীর নিশাকালে বিজয়া একাকিনী তাহার মুমূর্ষু জননীর শুশ্রূষায় নিযুক্তা; রজনী প্রায় শেষ হইতে চলিল, তথাপি বালিকা এখন জননীর কাছ ছাড়া হয় নাই। ঠিক সমভাবেই বসিয়া জননীর জাগরণ প্রতীক্ষা করিতেছে। বিজয়ার মাতামহ তাঁহার দুহিতার ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে গ্রাম্য চিকিৎসালয়ে ঔষধ আনিতে গিয়াছেন, এখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। জননীর সমূহ পীড়া দেখিয়া কি স্নেহময়ী

কন্যা স্থির থাকিতে পারে? একাকিনী থাকিলে পাছে জননীর কোন কষ্ট হয়, এইজন্য বিজয়া রোগীর শয্যা পার্শ্বে স্থিরভাবে বসিয়া আছে। অদূরে একটী মৃন্ময় প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। গৃহের দ্বার ভিতর হইতে আর্গলবদ্ধ। বিজয়া অনিমিষ লোচনে, রাহুগ্রস্থ শশীর ন্যায় তাহার জননীর মরণোন্মুখ মলিন বদনের প্রতি তাকাইয়া ভাবিতেছে—হায়! একি হইয়াছে। যে বদনমণ্ডল দশদিন পূর্ব্বে লাবণ্যময়, কত প্রশান্ত, প্রভাশালী ছিল, যে বদন-চন্দ্রমার সুধা বর্ষণে আমার হৃদয়ের ক্ষুধা তিরোহিত হইত, আজ সেই মুখমণ্ডল কে এমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার আচ্ছাদনে অমানিশার ন্যায় অন্ধকারময় করিয়া দিয়াছে? দশ দিন পূর্ব্বে যে কোমল অধর পল্লব কত হাসি হাসিত, সস্নেহে যমুনার মুখে কত শত স্নেহ-চুম্বন প্রদান করিত, আজি কোন নির্দ্দয় সেই অধর পক্ষে হাসি রাশির পরিবর্ত্তে নিবিড় কালিমা রাশি ঢালিয়া দিয়াছে। প্রফুল্ল কমলসন্নিভ লোচন যুগল—যাহা দশদিন পূর্ব্বে কত উজ্জ্বল ছিল, কত স্নেহ ধারা বর্ষণ করিত হায়! আজি কে সে পাষণ্ড তাহা স্থির, নিশ্চল নিস্পন্দ, নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। সরলা বালিকা ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ভাবিতে ভাবিতে বালিকার মস্তিস্ক বিঘূর্ণীত হইতে লাগিল, দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। সারা রজনী জাগরণে অবশ কলেবরা বিজয়া ধীরে ধীরে তাহার জননীর শয্যার পার্শ্বে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল।

এদিকে ক্রমশঃ দীপ নির্ব্বাণ হইতেছে, জীবন প্রদীপ ধীরে ধীরে তৈল বিহীন হইতেছে, আর কতক্ষণ জ্বলিবে? রোগিণীর

প্রাণ বিহঙ্গম সেই কঙ্কাল-পিঞ্জরে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, কৃতান্ত-মার্জ্জারের ভীষণ তাড়নায় তাহার অন্তিম যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। কিন্তু বিজয়া নিদ্রিতা। হায় হতভাগিনী তুমি সরলা বালিকা, কালরহস্য কেমনে বুঝিবে। কেমনে বুঝিবে যে কালের স্রোত প্রবলবেগে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইয়া অনন্ত কাল সমুদ্রে বিলীন হইতেছে। পার্থিব স্নেহ, মমতা কিছুতেই এ প্রবল স্রোতে বাধা দিতে পারে না। বিজয়া তুমি এখনও নিদ্রিতা, কিন্তু তোমার স্নেহময়ী জননী যে আজ তোমার অজ্ঞাতসারে সেই চির প্রবাহিত কাল সমুদ্রের প্রবল প্রবাহে পতিত হইয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। এ মর জগতে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইবেনা। শত বর্ষ ধরিয়া অন্বেষণ কর না কেন, অসহ্য মর্ম্মপীড়ায় রোদন ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ কর না কেন, হায়! তেমনটী আর ইহজীবনে কোথাও দেখিতে পাইবে না।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠক্ ঠক্ করিয়া বহির্দ্বারের শিকল নড়িল কিন্তু বিজয়া নিদ্রিতা, এ শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। পুনবার শব্দ হইল, তথাপি বালিকার চৈতন্য হইল না। তখন বাহির হইতে কম্পিত কণ্ঠে কে ডাকিল বিজয়া ও বিজয়া।" কণ্ঠস্বরে বিজয়ার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; দ্রুতপদে যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। জনৈক বৃদ্ধ হাঁপাইতে হাঁপাইতে গৃহে প্রবেশ করিল।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল—দাদা। কই কবিরাজ মশাই আসিল না।

বৃদ্ধ বলিল না, তিনি এই ঔষধ দিয়াছেন।

বৃদ্ধ বিজয়ার মাতামহ; রোগীণীর পিতা কন্যাকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত দেখিয়া এই গভীর রজনী সময়ে কবিরাজ বাটী গমন করিয়াছিলেন। এবং তথা হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বৃদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া দীপালোকে রোগীর বদনের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই নিষ্প্রভ বদনমণ্ডলের প্রতি তাকাইয়া জীবনের কোনও চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া, নিতান্ত চিন্তিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে সেই পাংশুবর্ণ ক্ষীণ হস্ত খানি আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! একি, নাড়ীর স্পন্দন যে রোহিত হইয়াছে। বৃদ্ধের গণ্ড বহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইল! বিজয়া এতক্ষণ নির্নিমেষ লোচনে তাহার জননীর মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, স্নেহের স্থির দৃষ্টিতে তাহা নিরক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে হঠাৎ বৃদ্ধের বদন প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, তাঁহার গণ্ড বহিয়া প্রবল-বেগে অশ্রু প্রবাহ ছুটিয়াছে। তদ্দর্শনে বিজয়া ভীতা ও চকিতার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল—দাদা! কাঁদচ কেন? মা ভাল আছেত। এই বলিয়া বালিকা তাহার জননীর বুকের উপর পড়িয়া চিবুক ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল—মা, মা, মা, কিন্তু হায় সেই সুধা মাখা মাতৃসম্বোধন কে আর সাড়া দিবে। তাহার জননীর প্রাণ-বিহঙ্গম যে স্নেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়াছে, বিজয়ারও মা বলা চির তরে শেষ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাতামহ গৃহে।

শ্যামাচরণ বিজয়ার মাতামহ। বয়স প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর হইবে, কেশকলাপ কাশকুসুমসম শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি দেহ বলিষ্ঠ, মুখকান্তি উজ্জ্বল। বয়সের আধিক্য হেতু শরীরের কোনও প্রকার ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না।

বিজয়ার পিতার মৃত্যুর পর, বিজয়ার জননী তাহাকে লইয়া তাঁহার পিত্রালয়ে আগমন করেন এবং সেই অবধিই তিনি বিজয়াকে লইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। এই একমাত্র দুহিতা ব্যতীত এ জগতে বৃদ্ধ শ্যামাচণের আর অন্য কেহ ছিল না; সুতরাং আপন দুহিতা ও দৌহিত্রীকে পরম যত্নে লালন পালন করিতেছিলেন, কোনও বিষয়েই তিনি তাহাদিগকে তিলমাত্র কষ্ট দিতেন না।

জননীর মৃত্যুর পর বিজয়া কিছুদিন তাহার ঠাকুরদাদাকে বড়ই জ্বালাতন আরাম্ভ করিয়াছিল। বালিকা সদা সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকিত, চকিতের ন্যায় চারিদিক অবলোকন করিত, যেন তাহার কি হারাইয়াছে; তাহা সে এ ভূমণ্ডলে কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না। বৃদ্ধ শ্যামাচরণ সর্ব্বদাই বিজয়াকে কাছে কাছে রাখিতেন এবং নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী বা খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখিতেন। সময় কাহার অপেক্ষা করেনা। ইহার

পর দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বিজয়া এক্ষণে চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ার শারিরীক অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুকোমল দেহ, প্রীতিময় বদন মণ্ডল, আকর্ণ বিস্ফারিত সচঞ্চল লোচনদ্বয়, অজানুলম্বিত চারু চিকুরদাম, বিজয়ার রূপ সাগরে লাবণ্য ছটা যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। তাহার দেহ স্রোতস্বিনীতে যৌবনের জোয়ার লাগিয়াছে কিন্তু এখন আতট উচ্ছ্বাস আরম্ভ হয় নাই। হা হতভাগিনী, তোমার এতরূপ কি হইবে; এ অপরূপ রূপ রাশি কাহার পদে অঞ্জলি দিবে? অভাগিনী! তোমার কপাল পড়িয়াছে, তুমি যে বাল-বিধবা—অরণ্য কুসুমের ন্যায় নির্জ্জনে প্রস্ফুটিত হইয়াছ, নির্জ্জনেই শুষ্ক হইয়া যাও।

* * * *

বিজয়ার একজন বাল্য-সখী ছিল তাহার নাম জয়াবতী। জয়াবতী তাহাদের একজন প্রতিবাসিনীর কন্যা, দুইজনে এক স্থানেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সমবয়স্ক এবং সমদশাপন্ন বলিয়া বাল্যকাল হইতেই উহাদের ভালবাসা প্রগাঢ় হইয়াছিল। উভয়ে উভয়ের সঙ্গ ছাড়িয়া একদণ্ডও থাকিতে পারিত না। সকল সময়েই তাহাদিগকে একত্র দেখা যাইত।

বিজয়া রন্ধন কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। এখন সে তাহার ঠাকুরদাদার গৃহিনী বলিলেও চলে। শ্যামাচরণের গৃহকর্ম্ম অতি সামান্য হইলেও বিজয়াকে সমস্তই করিতে হইত। গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া অবসর সময়ে বিজয়া তাহার ঠাকুরদাদার সুপক্ক কেশকলাপ বাছিয়া দিয়া থাকে, কখনও বা বাল্য সহচরী

জয়াবতীর সহিত নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকে সময় কাটাইতে থাকে। বিজয়ার দুঃখময় জীবন এইরূপ হাসি খেলায় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাগিরথী বক্ষে।

পূতস্তোয়া ভাগিরথীর অগাধ জলরাশি তর্ তর্ করিয়া প্রবল বেগে সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য তরঙ্গ রঙ্গভরে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। সলিল-শীকর-বাহী প্রবল সমীরণ শন্ শন্ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নাবিকেরা অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়াছে। অসংখ্য পালভরা তরণী নাচিতে নাচিতে স্রোতের দিকে ছুটিয়াছে। নবোদিত বালার্ক-কিরণ-কিরীট অসংখ্য শ্রেণীবদ্ধ লহরী শিরে ঝিকি মিকি করিতেছে। নানাবিধ জলচর পক্ষী তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। কেহ বা উড়িতেছে, কাহার সহিত পাকশাট মারিয়া আবার সাঁতার দিতেছে।

আজি মাঘী পূর্ণিমা—গঙ্গাস্নানের অতি পবিত্র যোগ। দেশ দেশান্তর হইতে যাত্রীগণ আসিয়া মহেশপুরের ঘাটে সমবেত হইয়াছে, লোকের কলরবে কান পাতা যায় না। এই পবিত্র দিনে পাপরাশি বিধৌত করিবার মানসে আজ অসংখ্য নরনারী জাহ্নবীর পূত সলিলে অবগাহন করিতেছে। কেহ বা "পতিত-পাবনী মা" এই পতিত জনের প্রতি কৃপা কর মা বলিয়া গঙ্গায় ডুব দিতেছে কেহ বা "মাতর্গঙ্গে ত্রাণ কর" বলিয়া জলে নামিবার পূর্ব্বে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা জল লইয়া মস্তক স্পর্শ করতঃ জলে

নামিতেছে, কেহ বা অৰ্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছে, কেহ বা গঙ্গামৃত্তিকায় শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া গাল-বাদ্য ও কক্ষবাদ্য করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিতেছে। কোন কোন বালক তীর হইতে ঝাঁপাইয়া জলে পড়িয়া সাঁতার দিতেছে, কেহবা স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্রে তীরে উঠিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। ক্রীড়াপরবশ ছোট ছোট বালিকাগণ কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া টুপ টুপ করিয়া ডুব দিতেছে। অসংখ্য নরনারী অঞ্জলি পূর্ণ জবা, বিল্বদল, দূর্ব্বা প্রভৃতি পূজোপহার লইয়া গঙ্গায় অর্ঘ প্রদান করিতেছে।

রঙ্গপ্রিয় অগণন লহরী মালা ঐ সকল কুসুম আপন আপন শিরে ধরিয়া সাহ্লাদে নাচিতে নাচিতে সাগর পানে ছুটিয়াছে। তীরে হাট বসিয়াছে। অসংখ্য নরনারী ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। ভাগিরথীর গভীর জল-কল্লোল অসংখ্য জন কোলাহলের সহিত মিশিয়া চতুর্দ্দিক এক অপূর্ব্ব মোহন মন্ত্রে মুখরিত করিয়াছে।

এমন সময়ে দুইটী ষোড়শী তীর হইতে ধীরে ধীরে গঙ্গা বক্ষে নামিল। উভয়ের কটিদেশ অঞ্চল-পরিবেষ্টিত। পাঠক! এই যুবতী দুইজন আর কেহই নহে, আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বিজয়া ও জয়াবতী।

বিজয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া ডাকিল—জয়া।

জয়া উত্তর করিল—কেন?

বিজয়া। আয়লো আজ আমরা গঙ্গায় সাঁতার দিই।

বিজয়া বেশ সাঁতার দিতে পারিত, জয়া তাদৃশ সন্তরণ পটু

ছিলনা—তাই অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল—না ভাই, যে তরঙ্গ।

বিজয়া। কেনলো, তোর মনেতে ভয় হয় নাকি?

জয়া। তা নয় ভাই! আজ বড় শীত। পাছে হাত পা অবশ হয়ে ডুবে যাই?

বিজয়া। সংসার দাবানলে দিবানিশি দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা গঙ্গার সুশীতল সলিলে আশ্রয় লওয়া কি সুখকর নয়?

জয়া বাক্‌চাতুর্য্যে বিজয়ার সমান ছিল না। অগত্যা সাঁতার দিতে স্বীকৃতা হইল। দেখিতে দেখিতে গাঙ্গিনীর সুনির্ম্মল শ্বেতনীরে দুইখানি হৈম-প্রতিমা ভাসমান হইল।

জয়া বিজয়া তরঙ্গময়ী ভাগিরথীর অগাধ জলরাশির ঘাত প্রতিঘাতে ভাসিতে ভাসিতে বহুদূর যাইয়া পড়িল। বিজয়া জয়া অপেক্ষা অধিক সন্তরণ পটু, একারণ বিজয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, জয়া ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

কিয়দ্দূর যাইয়া জয়ার ক্লান্তিবোধ হইল, তরঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া তাহার হাত পা অবশ হইয়া আসিতে লাগিল; সে ডাকিল—বিজয়া।

বিজয়া। কেন?

জয়া। আর বেশী দূর যাইয়া কাজ নাই, ফিরিয়া আইস।

বিজয়া। আমি আর ফিরিবনা।

জয়া। কেন?

বিজয়া। গঙ্গার শীতল জলে সংসার জ্বালা নিবারণ করিব।

বিজয়া জয়াবতীর অনুরোধ শুনিল না। অগত্যা সে বহু-কষ্টে তীরাভিমুখে ফিরিয়া আসিল। বিজয়া আর ফিরিলনা—সে প্রবল তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে আরও দূরে যাইয়া পড়িল। নিমেষমধ্যে গঙ্গার স্রোত ফিরিল, তরঙ্গ ভাঙ্গিল, গঙ্গাবক্ষ স্ফীত ও স্তম্ভিত হইল। গঙ্গা-সলি-লের হঠাৎ ঈদৃশ পরিবর্ত্ত দেখিয়া বিজয়া একবার মুখ তুলিল, —দেখিল অদূরে এক পর্ব্বতাকার জলরাশি তীব্রবেগে তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

বিজয়া। ডাকিল—জয়া।

জয়াবতী তখনও তীরে পঁহুছিতে পারে নাই, সে উত্তর করিল—কেন বিজয়া?

বিজয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল—ঐ দেখ। জয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল—গঙ্গায় বাণ আসিয়াছে। জয়া তখন কম্পিত কণ্ঠে কহিল ভাই! আমিত বলিয়াছিলাম, এখন—আর উপায় নাই, বিজয়ার বাহুর শক্তি রহিত হইয়াছে।

জয়া বহুচেষ্টায় তীরে আসিয়া লাগিল, কূল পাইল। অবশ কলেবরা বিজয়াও ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাণ আসি-য়াছে দেখিয়া গঙ্গাবিহারিণী জনসঙ্ঘ জল ছাড়িয়া দ্রুতপদে তীরে উঠিল, নাবিকেরা নিজ নিজ তরণী সুদৃঢ় রূপে বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ করিল। জয়া তীরে উঠিয়াছে, বিজয়া কেবল মাঝ গঙ্গায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই পর্ব্বতাকার ভীষণ জলরাশি আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল—বিজয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। গঙ্গাতট

লোকে লোকারণ্য, ধারে অসংখ্য তরণী সারি সারি বাঁধা রহি-য়াছে কিন্তু কেহই বিজয়ার উদ্ধারের চেষ্টা করিল না, কোন নাবিকই তরনী খুলিল না। নিমজ্জনোন্মুখ বিজয়াকে রক্ষা করিতে কেহই সাহস করিল না সকলেই ভীতচিত্তে বিজয়ার দিকে তাকাইয়া রহিল। বিজয়ার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ আরও অবশ হইতে লাগিল, এদিকে উত্তাল তরঙ্গ যেন বিজয়াকে গ্রাস করিবার জন্য গভীর গর্জ্জনে তাহার প্রতি ধাবিত হইল।

এমন সময়ে তীর হইতে জন কোলাহল ভেদ করিয়া এক-জন বলিষ্ঠকায় সুন্দর যুবাপুরুষ "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া চিৎকার করতঃ সেই ভীষণ গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিল। সকলেই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যুবক অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া বিজয়ার উদ্ধা-রার্থ সেই ঘোররবা বীচিমালা—বিমণ্ডিতা গঙ্গাসলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিল এবং দ্রুতবেগে সাঁতার দিয়া বিজয়ার নিকট আসিল। যুবক যখন বিজয়ার নিকটে আসিল তখন সে সংজ্ঞা-হীনা, একবার ডুবিতেছে একবার উঠিতেছে। যুবক আর কাল বিলম্ব না করিয়া বিজয়ার দুই বাহু নিজ বক্ষে আবদ্ধ করতঃ তীরাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু হায়! যুবকের এত চেষ্টা, এরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকার সকলই বৃথা হইল। অনতিবিলম্বে সেই পর্ব্বতাকার জলরাশি ভীমরবে তাহাদের উপর পড়িয়া নিমেষের মধ্যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। তীরস্থিত অসংখ্য কণ্ঠে হাহাকার ধ্বনী সমুত্থিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

জলস্রোতের ন্যায় সময়-স্রোত ধীরে ধীরে অনন্ত কাল সমুদ্রে প্রবাহিত হইতেছে। অবিশ্রান্ত প্রবাহমান সময়-স্রোত কিছুরই বাধা মানে না। সুখ, দুঃখ, মায়া, মমতা, হর্ষ, বিষাদ কাহারও মুখের প্রতি দৃষ্টি করে না প্রবল টানে সাগর পানে ছুটিতেছে। যুবক যুবতী গঙ্গাবক্ষে জলমগ্ন হওয়ার পর আজ দেড় বৎসর অতীত হইয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল সংসারে এই দেড় বৎসরের মধ্যে যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—কে তাহার ইয়ত্তা করে। এই দেড় বৎসরের মধ্যে সংসার সমুদ্রে যে কত বিম্ব উঠিল—ভাঙ্গিল, আবার উঠিল—ভাঙ্গিল কে তাহার গণনা করে। কেহই তাহা দেখিল না, কেহই তাহার জন্য এক ফোঁটা অশ্রু বর্ষণ করিল না। কাল কিন্তু সকলের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে সারা দেড়টী বৎসর অতিক্রম করিয়া মানবের পরমায়ু হ্রাস করিয়া দিল।

পাঠক পাঠিকারা যুবক যুবতীর উদ্ধারের কোনও সংবাদ না পাইয়া বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। বিজয়া ও তাহার উদ্ধার কর্ত্তা যুবক জলমগ্ন হইবার পর, উভয়ে গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কিয়দ্দূর গমন করতঃ একখণ্ড সুবৃহৎ কাষ্ঠ ফলক প্রাপ্ত হইল। উভয়ে সেই কাষ্ঠ ফলক সাহায্যে তরঙ্গায়িত গঙ্গার অগাধ জলরাশির উপর ভাসিতে লাগিল।

"রাখে হরি মারে কে, আর মারে হরি রাখে কে" এই অমৃতোপম বচনের সত্যতা আমরা পদে পদে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় না, আমরা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। আয়ু থাকিলে তাঁহার কিছুতেই মৃত্যু হয় না। যুবক যুবতী হতাশ হইয়া যখন কাষ্ঠখণ্ড সাহায্যে জলের উপর ভাসিতেছিল, তখন একখানি নৌকা পালভরে তরঙ্গ ভেদ করিয়া সেই দিকে আসিল। নৌকার একজন মাত্র আরোহী ছিলেন—নাম অভয়ানন্দ স্বামী। ইনি ৺বারানসী ধাম হইতে তাহার শিষ্যের বাটী আগমন করিতেছিলেন। মহেশ-পুরের জমীদার বিমলানন্দ রায় ইঁহার শিষ্য। তিনি নৌকার ছাদে বসিয়া সন্ধাকালে ধরণীর শোভা সন্দর্শনে চিত্তপুলকিত করিতে-ছিলেন হঠাৎ সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল, দূরে দুই প্রাণী কাষ্ঠখণ্ড সাহায্যে জলে ভাসিতেছে দেখিয়া তিনি মাঝি-গণকে সেই দিকে নৌকা চালনা করিতে বলিলেন। নাবিকগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই দিকে নৌকা লইয়া গেল। নৌকা নিকটবর্ত্তী হইলে যুবককে নৌকা ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে দেখিয়া অভয়ানন্দ স্বামী নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া যুবককে ধারণ করিলেন, পরে যুবতীকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। তখন সন্ধ্যার ধূসর বর্ণ চারিদিকে বিস্তৃত হয় নাই; কাজেই চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। অভয়ানন্দ স্বামী যুবকের মুখের প্রতি তাকাইয়া অতিশয় বিস্ময় সহকারে "একি বিমলানন্দ তুমি এরূপ অবস্থায়?" বিমলানন্দ তরণীর উপর নিজ ইষ্টদেব অভয়ানন্দ স্বামীকে দেখিয়া পদধূলি গ্রহণ করতঃ বলিলেন—সে

অনেক কথা দেব।" আপনার কৃপায় যে রক্ষা পাইলাম, এই পরম সৌভাগ্য। একণে আপনি মাঝিদের একটু আগুন করিতে বলুন, রমণীটীর অনেকক্ষণ হইল চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়াছে, উহাকে অগ্রে বাঁচাইবার চেষ্টা করুন, পরে অন্যকথাবার্ত্তা হইবে। মাঝিরা তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠ জ্বালিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিল এবং স্বামীজী ও বিমলানন্দ উভয়ে যুবতীকে অগ্নির উত্তাপ দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া যুবতী একবার চক্ষু মেলিয়া কিছুক্ষণ বিমলানন্দের মুখের দিকে তাকাইয়া পুনরায় চক্ষু মুদিত করিল। বিমলানন্দ যুবতীকে পুনরায় চক্ষু মুদিত করিতে দেখিয়া গাত্রস্পর্শে দুই তিনবার ডাকিলেন কিন্তু কোনও সাড়া শব্দ পাইলেন না। তখন তিনি মনে করিলেন সমস্তদিন অনাহারে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, কিছু বলকারক খাদ্য আবশ্যক। তিনি নাবিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মহেশপুর এখনও অনেক দূর, তবে নিকটে একটী বাজার আছে। তাহা শুনিয়া—বিমলানন্দ নাবিকগণকে পারিতোষিক দিবার লোভ দেখাইয়া জোরে নৌকা চালাইতে বলিলেন। অমনি মাঝিরা হেঁইয়া হেঁইয়া রবে ঝুপ ঝাপ দাঁড় ফেলিতে লাগিল। ভাগীরথীর বিস্ফারিত বক্ষ ভেদ করিয়া তরণী মহেশপুরাভিমুখে ছুটিল। ততক্ষণ অভয়ানন্দস্বামী অগ্নির উত্তাপে যুবতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জমীদার বাটী।

অনেকক্ষণ হইল দিবা অবসান হইয়াছে। সন্ধ্যাকে বিদায় দিয়া শুক্লবসনা যামিনীসুন্দরী ধীরে ধীরে ধরণীবক্ষে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। নির্ম্মলগগণে তারাকান্ত তারাহারে সুসজ্জিত হইয়া আপাতঃ রাজত্ব বিস্তার করিয়াছেন। নৈশ নীলাকাশে পরিব্যাপ্ত সুধাংশুর শুভ্র রজত কিরণে চারিদিক হাসিতেছে।

অন্ধকারময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ গুলি সেই আলোকে পুলকিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। নৈশ সমীরণ নববিকসিত কুসুমদামের সৌরভ লইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। এই শুভ্র চন্দ্রালোকে মহেশ পুরের বিমলানন্দ রায়ের সুরম্য অট্টালিকা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। অট্টালিকার চারিধারে নানাজাতীয় ফল পুষ্প বৃক্ষ পরিশোভিত প্রমোদ উদ্যান। মধ্যে স্থানে স্থানে কুসুমিত লতাগুল্ম মারুত হিল্লোলে দুলিতেছে। কোথাও বা সমীরণ স্পর্শে সেফালিকা রাশি ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। উদ্যানের উত্তর প্রান্তে একটী সুবৃহৎ সরোবর। উহার নাম সোহাগ দিঘী : চারিধারে বাঁধা ঘাট; বাহিরের লোকে জল লইবার জন্য একটী যাতায়াতের পথ তাহার দুই ধারে আম জাম লিচু প্রভৃতি বৃক্ষ সকল সারি সারি ফল ভরে অবনত, লজ্জায় নতমুখ—নির্লজ্জ সমীরণ তাহাদের

লজ্জা ভাঙ্গিবার জন্য এক একবার আসিয়া ঝাপট মারিতেছে। সোহাগ দিঘীর চারিধারে বেল, যুই, গোলাপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষ, তৎপার্শ্বে সারি সারি বৃহৎ ফল বিহীন ঝাউবৃক্ষ সকল মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান, নৈশ সমীরণে শাঁ শাঁ শব্দ করিতেছে। রাত্রি প্রায় প্রহর অতীত, উদ্যান নীরব, নৈশ-নীলিমায় দিঘীর কাল জল শুভ্র সুধাংশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছে।

এমন সময়ে কলসী কক্ষে দুইটী যুবতী ধীরে ধীরে উত্তর দিকের দরজা দিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সোপানাবলী অবতরণ করিয়া সরসীবক্ষে কলসী দুইটী ভাসাইয়া দিল। রমণীদ্বয়ের পদস্পর্শে স্থির সলিল রাশি তরঙ্গায়িত হইল, কলসী দুইটী সেই তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত হইয়া ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন উভয়ে জলে দেহার্দ্ধ নিমজ্জিত করিয়া বস্ত্রাদি ধৌত করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া একজন ডাকিল জয়া?

জয়া। কেন?

বিজয়া। আয় ভাই! আমরা একটী গান গাই। গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া বিজয়া ও জয়াবতী গাত্র প্রক্ষালন জন্য সোহাগ দিঘীতে আসিয়াছেন।

ইহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই আপনাদের পরিচিতা। জয়া তাহাতে সম্মত হইল। অমনি মনোমুগ্ধকর কামিনী-কণ্ঠ নিঃসৃত সুস্বর লহরী সমীরণ হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে গগণপথ প্লাবিত করিল।

কিছুক্ষণ পরে গীত সমাপ্ত হইল, উভয়ে আরও বেশী জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতে লাগিল। এইবার জয়াবতী বলিল "বিজয়া! চল ঘরে যাই।"

বিজয়া। কেন, ঘরে গিয়ে কি হবে, আয় না আর একটী গান গাই, এখানে ত আর কেউ নাই।

জয়া। না ভাই! রাত হয়েছে।

বিজয়া। তা হলেই বা তোর ভয় কচ্ছে নাকি?

জয়া। কিসের ভয় পাচ্ছে?

বিজয়া।—ভূতের?

জয়া। দূর ছুঁড়ি, তোর পাক।

বিজয়া। জয়া! সে আশীর্ব্বাদ আর আমায় কর্ত্তে হবেনা। সেত অনেক দিন পেয়েছে।

জয়া। তুই বড় বেহায়া।

বিজয়া। তাতে তোর কিলো, তুই ঘরে যাবি—যানা, তোর দাসীখৎ লেখান আছে; আমার ত আর তা নেই যে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ঘর যেতে হবে?

জয়া। দেখ বিজয়া! আমরা হিন্দুর মেয়ে, সতীত্বই আমাদের একমাত্র সম্বল। সুতরাং পরমেশ্বর আমাদের যে অবস্থায় রাখুন্ আমাদের সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে। তার চেয়ে উচ্চ আশা কর্ত্তে গেলেই মরন্। এই বলিয়া জয়াবতী নিজ জলপূর্ণ কলসী কক্ষে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। বিজয়া অনেক্ষণ নীরবে ঘাটে, বসিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হায়! আমার আবার গৃহ কি? এই নবীন

যৌবন, উজ্জ্বল রূপরাশি, অতৃপ্ত পিয়াসা যে আমার গৃহকে অরণ্য সমান করিয়াছে। কিসের জন্য সংসার, কাহার জন্য গৃহবাস। যদি আমার এই নবীন যৌবনে সোহাগ না মিলিল, এই তপ্ত আকাঙ্ক্ষার পূরণ না হইল, এই উজ্জ্বল রূপরাশির কেহ আদর না করিল, তবে আমার গৃহবাসে ফল কি—আমি কি লইয়া গৃহবাসী হইব! যাহার জীবনের উদ্দেশ্য নাই, প্রাণের আশা নাই, মনের শান্তি নাই, তাহার আবার গৃহ কি? তাহার পক্ষে গৃহ ও অরণ্য দুই সমান। এইরূপ নানা-চিন্তায় বিজয়াকে বিব্রত করিয়া তুলিল—শেষে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—হায়! কেন তাঁহাকে দেখিয়া-ছিলাম। না দেখিলে ত এত জ্বালা সহ্য করিতে হইত না—যদি দেখিলাম ত মরিলাম না কেন? যতদিন না তাহাকে দেখিয়াছিলাম, ততদিন ত আমার এরূপ অবস্থা ঘটে নাই। তখন কোনও আশা ছিলনা—কোনও উদ্দেশ্য ছিলনা, সুখ দুঃখ কিছুই অনুভব করিতে পারিতাম না। সংসারে এক প্রকার জড় পদার্থের ন্যায় বাস করিতেছিলাম, ঠাকুরদাদার সেই অমিয় জড়িত সান্ত্বনা বাক্যে কত সুখ পাইতাম, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না। যে দিন হইতে তঁাহাকে দেখিয়াছি, যে দিন হইতে তাঁহার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া আপনি প্রাণ হারাইলাম, সেই দিন হইতেই আমার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি পাগল হইয়াছি, মনে করি—তাঁহার সে মোহন-মুরতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিব, তাঁহাকে ভুলিয়া যাইব—সেইজন্য এত দিন আমি এ পথে আসি নাই। কিন্তু ভুলিতে পারিলাম কৈ? যত দিন যাই-

তেছে, দুরাশায় পোড়া প্রাণ তত আকুল হইতেছে। হায়! বাল-বিধবা হিন্দুর পবিত্র সংসারে কণ্টকবৃক্ষ।

এই সময়ে বিমলানন্দ রায় অসহ্য গ্রীষ্ম হেতু একাকী তাঁহার প্রমোদ উদ্যানে আসিয়া সুশীতল বায়ু সেবন করিতেছিলেন। ক্রমে উদ্যানের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া সোহাগ দিঘীর ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। চাঁদের আলোয় চারিদিক হাসিতেছিল, হঠাৎ পুষ্করিণীর দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন—একটী যুবতী জলে বসিয়া কি ভাবিতেছে। বিমলানন্দ তদ্দর্শনে বিশেষ বিস্ময়ান্বিত হইয়া আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাত্রি কালে কে আপনি পুষ্করিণীর জলে অবগাহন করিতেছেন?" বিজয়া হঠাৎ পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া কোনও উত্তর দিল না এবং অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া জল হইতে উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিমলানন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?" বিজয়ার কথা কহিতে লজ্জা হইল। কিন্তু আবার ভাবিল লজ্জা কিসের, যিনি একদিন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন—যিনি আমার জীবনদাতা তাঁহার নিকট লজ্জা করিলে চলিবে কেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্যইত আমি সোহাগ দিঘীর ঘাটে একাকিনী এখনও পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি। বিজয়া সাহসে ভর করিয়া উত্তর করিল—"আপনি কে?"

বিমলা। আমি বিমলানন্দ রায়, এই উদ্যান আমারই।

বিজয়া। আমার পরিচয়ে আপনার আবশ্যক কি?

বিমলা। আপনি কে এবং কিজন্যই বা এখন ঘাটে রহিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে দোষ কি?

বিজয়া। আপনার পুষ্করিণীর জল অতি শীতল এবং পরিষ্কার দেখিয়া লইতে আসিয়াছি।

বিমলা। তা এত রাত্রে কেন? দিবাভগে আসিলেইত হইত?

বিজয়া। হাঁ ইহা ব্যতীত আরও একটু আবশ্যক ছিল।

বিমলা। কি সে আবশ্যক শুনিতে কোন বাধা আছে কি?

বিজয়া। আপনি অতুল ধনের অধীশ্বর, দুঃখিনীর আত্ম-কাহিনী শুনিয়া আপনার লাভ কি?

বিমলা। যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে উপকারের আশাও করিতে পারেন। এই জন্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

বিজয়া আর থাকিতে পারিলনা—জীবনদাতা প্রভুর অমায়িকতা দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হইলেন, একদিন অচৈতন্য অবস্থায় যাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ভীষণ সমুদ্র পার হইয়াছেন, তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করায় কোনও পাপ নাই বিবেচনা করিয়া, আপনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতঃ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন —"অভাগিনী বিজয়াকে চিনিতে পারেন কি?" বিজয়ার সহিত বিমলানন্দের আজ প্রায় দুই বৎসর দেখা নাই। বিমলানন্দ বিজয়ার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে চমকিত হইলেন, তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবলবেগে শোণিত-স্রোত ছুটিল—মুহূর্ত্ত মধ্যে হৃদয়পটে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল। বিমলানন্দ ভাবিলেন—আহা! সেই মুখখানি। বিমলানন্দ কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন—"তোমার কি কোন আবশ্যক আছে?"

বিজয়া। একটী কথা বলিতে আসিয়াছি।

বিমলা। কি কথা?

বিজয়া তখন বাঙ্মনশ্চিত্ত বিশেষরূপে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"বিমলানন্দ! তোমারই আদেশে আমি এত দিন ধরিয়া তোমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, বহু চেষ্টা করিয়াও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। তাই সংসারে থাকিয়া তোমার সুখের পথের কণ্টক হইব না ভাবিয়া, আমার মর্ম্ম-পীড়ার, শত বৃশ্চিকদংশনে জর্জ্জরিত দেহভার গঙ্গাবক্ষে বিস-র্জ্জন দিতে গিয়াছিলাম। কেন তুমি আমায় বাঁচাইলে? তুমি আমায় ভুলিতে বলিয়াছিলে—আমি চিরতরে ভুলিবার জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া যন্ত্রণার অবসান করিতে গিয়াছিলাম, কেন তুমি আমায় তাহাতে বাধা দিলে। তোমার আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া নানা চিন্তায় আমার দেহ তপ্ত মরু-ভূমি হইয়াছিল—কেন তুমি আবার তাহাতে আশার সুখ-প্রস্রবণ ছুটাইলে? তোমাকে পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া আমি হতাশ-হৃদয়ে সকল জ্বালা যুড়াইতে গিয়াছিলাম, কেন তুমি তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলে? তোমার বিরহে এই জীবন-স্রোতস্বি[illegible]র ধীরে শুষ্ক হইতেছিল, কেন তুমি তাহাতে পুনরায় ত[illegible]রি সিঞ্চনে সঞ্জীবিত করিলে? সে দোষ কাহার?—[illegible] যখন মরিতে দাও নাই, তখন ইহার জন্য তুমিই দ[illegible]

বিমলানন্দ [illegible] ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন—বিজয়ার বাক্য শেষ হইলে [illegible]—"বিজয়া! একজনকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলে [illegible] দোষ আছে?"

বিজয়া। অবশ্য আছে। যে জীবনের কোনও উদ্দেশ্য নাই, যাহা কেবল ভার মাত্র—যন্ত্রণার আকর। তাহাকে সে জ্বালা হইতে পরিত্রাণ করিতে দেওয়াই উচিত? যখন তাহাতে বাধা দিয়াছ, তখন তুমিই সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধী।" এই বলিয়া বিজয়া ঘাটে নামিয়া আপন কলসী পূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিল।

বিমলানন্দ কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘাটে বসিয়া রহিলেন। বিজয়ার অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিক বিমলানন্দের হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। কিন্তু কি করিবেন উপায় নাই। সমাজ ত আর তাহার দুঃখ দেখিয়া কিছু প্রতিকার করিবে না। বিজয়া এত অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছে যে তাহার বিবাহের কথা, স্বামীর কথা কিছুই মনে নাই। এই ফুটন্ত যৌবনে তাই সে প্রমাদ গণিতেছে। নিরাশাপূর্ণ, কৌমারের মাধুর্য্যময়, যৌবনের প্রেমময় মুখখানি দেখিয়া বিমলানন্দ আত্মবিস্মৃত হইয়া উদাস মনে গৃহে ফিরিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চিন্তাজ্বরে জরজর।

চিন্তার তুল্য শত্রু মানবের আর নাই। সুস্থ মানবকে অসুস্থ করিতে চিন্তার ক্ষমতা অসীম। শ্যামাচরণের বিপুল বংশের একে একে সকলেই কালসাগরে নিহিত হইয়াছে, যে বংশের লোক সংখ্যা দেখিয়া এক সময় মুঙ্গেরের অন্তর্গত মহেশ-পুরের প্রবলপ্রতাপান্বিত জমীদার বংশও ভীত হইতেন, আজ সেই বংশে একমাত্র শ্যামাচরণ ব্যতীত আর কেহই নাই। শ্যামাচরণ জামতার মৃত্যুর পর কন্যা ও দৌহিত্রীটীকে স্বগৃহে আনিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন কিন্তু কালের চক্ষে তাহাও সহ্য হইল না, অকালে সে রত্নটীকেও কাল হরণ করিল। শ্যামাচরণ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না, তাহার পৈতৃক আয়ে পল্লী-গ্রামে থাকিয়া একপ্রকার বেশ সুখেসচ্ছন্দে কাটিত, এক দিনের জন্য তিনি কন্যাকে বা দৌহিত্রীকে কোনও প্রকার কষ্ট দেন নাই; যারপরনাই সুখে লালন পালন করিয়া আসিতেছিলেন। হঠাৎ কন্যাটীর বিয়োগ-জনিত-দুঃখে বৃদ্ধ শ্যামাচরণ বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কি করিবেন—কালের নিকট ত আর কাহার প্রভুত্ব খাটিবে না। বৃদ্ধ এতদিন বেশ সুস্থ ও সবল শরীরে মনের সুখে কাল কাটাইতেছিলেন, পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তিনি বৃথা শরীর নষ্ট করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে স্বভাবতই যেন তাঁহার আনুপূর্ব্বিক

সমস্ত ঘটনা স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। হায়! কি ছিলাম আর কি হইতে হইল, যে বংশের কলরবে একদিন গৃহ প্রাঙ্গন মুখরিত হইত, বিপুল রক্ষবংশের ন্যায় যাহার লোকসংখ্যা অগণিত ছিল—হায়! আজ সেই বংশের পরিণাম কি ভয়াবহ হইয়াছে। ভগবান! তুমি সব করিতে পার, তুমি অরণ্যকে নগর করিতে পার, আবার নগরকে অরণ্য করিতে তোমারই ক্ষমতা। তোমার ক্ষমতার গতিরোধ করা ত্রিলোকে কাহার সাধ্য নাই। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল বংশের পরিণতি দেখিলে, মনে হয়, জগতে কিছুই কিছু নয়—ধন বল, জন বল, সমস্তই বৃথা,—কালের কুঠারাঘাতে সকলই মুহূর্ত্তে ধ্বংশ হইতে পারে।

দিন যাইতেছে—শেষের দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। আজ না হয় কাল—অথবা বৎসরান্তে তাহাকেও সকলের মত ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু বিজয়ার দশা কি হইবে? তাঁহার মৃত্যুর পর বিজয়াকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে! হায়! অভাগিনী বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছে: সে সংসারে আদর ভালবাসা কিছুরই আস্বাদ জানে না বা বুঝে না। ঠাকুরদাদার আদরে প্রতিপালিতা, একদিনের জন্য কষ্ট কাহাকে বলে জানে না। সকলে যেমন বেশভূষা করে, আহারাদি করে, বিজয়াও তেমনি করিত, তেমনি পরিত; বৃদ্ধ প্রকারান্তরে নিষেধ করিলেও সে তাহা তত গ্রাহ্য করিত না। শ্যামাচরণও স্ত্রীলোকের মত তাহার সহিত অহরহ এবিষয় লইয়া কলহ করিতেও পারিতেন না। এসকল স্ত্রীলোকের কাজ, পুরুষ হইয়া তিনি কেমন করিয়া

এই সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন, কাজেই বিজয়াকে বাধা দিবার কেহই ছিল না।

সময় কাহার হাতধরা নয়! তুমি বাল-বিধবাই হও আর যাহাই হও, যৌবন ত তোমায় ছাড়িবে না, সময় হইলেই সে আপনার দলবল লইয়া আসিবে, এখন বিজয়া পূর্ণ-যৌবনা—ভাদ্রের ভরা গাঙ্গের ন্যায় তাহার দেহ সরোবরে রূপের তরঙ্গ খেলিতেছে। যে দেখে সেই মোহিত হয়—এ অবস্থায় শ্যামাচরণের মৃত্যু হইলে বিজয়ার দশা কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। বৃদ্ধ জানিতেন বিজয়ার উদ্ধারের পর হইতে বিমলানন্দ তাহাকে বড় ভাল বাসেন, কিন্তু তাহার ন্যায় ধনী সন্তান কি বিজয়ার ভার গ্রহণ করিবেন। যদিও তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, যদিও তিনি আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত তথাপি তিনি কি বিধবা বিবাহে সম্মতি প্রদান করিয়া জাতি নষ্ট করিবেন? তবে ধনী সন্তান বিমলানন্দের কার্য্যে প্রতিবাদ করিবার লোক কেহই নাই। আর ইহা তাহাদের দেশ নহে; স্ত্রীবিয়োগ জনিত মনোকষ্টে কিছুদিনের জন্য মুঙ্গেরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন মাত্র। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্তই করিতে পারেন। এইরূপ নানাচিন্তায় বৃদ্ধ বিব্রত হইয়া অচিরেই নানাপ্রকার জটিল রোগে জড়িভূত হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ বয়সে গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইলে সে রোগ প্রায়ই মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। তাহার উপর বিজয়ার চিন্তায় রোগ ক্রমশঃ কঠিন ভাব ধারণ করিতে লাগিল। ভুক্তদ্রব্য কিছুই পরিপাক হয় না—রাত্রে নিদ্রা নাই—কেবল চিন্তা। দুর্বিসহ চিন্তার হস্তে পতিত

হইয়া বৃদ্ধের তেমন দেহ যেন, পুষ্পে কীট প্রবেশের ন্যায় ক্রমশঃ জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। শ্যামাচরণ স্থির করিলেন এ রোগে তাহার আর অব্যাহতি নাই; যতশীঘ্র হউক, তিনি বিমলানন্দকে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহার পর বিজয়ার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।

এ জীবনে বিজয়ার ভোগ কিছুই পরিতৃপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় তাহাকে নিরাশ্রয় দেখিলে দুষ্ট লোকে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আনায় মাঝারে রত্ন পাইলে পরদ্রব্য বলিয়া পাপের ভয়ে কে কোথায় তাহা ফেলিয়া দেয়। দুর্লভ এ রমণী-রত্ন বিনায়াসে পাইলে পাপের ভয়ে কেহই পশ্চাৎপদ হইবে না। হায়! বিমলানন্দ যদি তুমি গঙ্গার প্রবল তরঙ্গে আপনার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, বিজয়ার উদ্ধার সাধন না করিতে, তাহা হইলে শ্যামাচরণের এ বৃদ্ধ অবস্থায় এত চিন্তা করিতে হইত না, বিজয়ার ভাবনা ভাবিয়া তাহার সোণার দেহ কালি হইত না। বিমলানন্দ! তুমি নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া পরের জীবন রক্ষা করিলে, অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া ধন্য হইলে; এইবার তাহাকে পদাশ্রয়ে স্থান দান করিয়া পরোপকারী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিবে কি? লোক লজ্জা—ভয় বিসর্জ্জন দিয়া বিজয়ার ন্যায় রমণী-রত্নকে গ্রহণ করিতে তোমার মত একজন বীরপুরুষ বোধ হয় কখনই কুণ্ঠিত হইবে না। . . .

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু।

মুঙ্গের হইতে মহেশপুর একটী প্রান্তর মাত্র ব্যবধান। বিমলানন্দ ঘটনাচক্রে আজ চারি বৎসর এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। তিনি প্রত্যহই মহেশপুর গ্রামে বেড়াইতে যাইতেন। সন্ধ্যাকালে মহেশপুরের কালীবাটীতে আরতি দেখিয়া বাটী ফিরিতেন—ইহা তাঁহার প্রাত্যাহিক কার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। শ্যামাচরণও প্রত্যহ এই স্থানে আরতি দেখিতে আসিতেন—এইজন্য উভয়ের মধ্যে বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল: শ্যামাচরণকে বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া তিনি সাতিশয় মান্য করিতেন। তারপর বিজয়ার জীবন রক্ষার পর হইতে তাহাদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছিল। দৌহিত্রীর প্রাণ রক্ষা করায় শ্যামাচরণ তাঁহার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন, দেখা হইলেই তাহাকে অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাইতেন কিন্তু বিমলানন্দ তাহাতে বড়ই অপ্রতিভ হইতেন এবং বলিতেন "মহাশয়! আপনার ন্যায় বয়োজ্যেষ্ঠের আমার নিকট ঐরূপ ভাবে হীনতা স্বীকার করিলে আমি বড়ই লজ্জিত হই। ঐরূপ কার্য্য মানুষ মাত্রেই করিয়া থাকে, তাহার জন্য আপনি আর আমার নিকট এরূপ অনুনয় বিনয় করিয়া আমাকে, পাপভাগী করিবেন না।" বৃদ্ধ শ্যামাচরণ সেই দিন হইতে তাহাকে মৌখিক আর

কোনও কথাই বলিতেন না। আন্তরিক তাঁহার নিকট বিক্রীত হইয়া রহিলেন।

* * * *

ক্রমান্বয়ে দুই তিনদিন শ্যামাচরণকে কালীমন্দিরে দেখিতে না পাইয়া বিমলানন্দ বড়ই ভাবিত হইলেন। তৎপর দিবস সংবাদ পাইলেন যে শ্যামাচরণ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন। বিমলানন্দ সেই দিন হইতে প্রত্যহ শ্যামাচরণ বাবুর বাটী আসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের বাটী যাওয়া, পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনের ভার বিমলানন্দ গ্রহণ করিলেন। আর বিজয়া পুনরায় মাতামহের শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন। দিন রাত্রি জ্ঞান নাই—আহার নিদ্রা ভুলিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া জননীর ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। হায়! একদিন ঠিক এরূপভাবে বিজয়া তাহার জননীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার মরণোন্মুখ মলিন মুখচন্দ্রিমা নিরীক্ষণ করিয়া কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল কিন্তু সে প্রবল অশ্রুপাতে কালের কঠিন হিয়া দ্রবীভূত হয় নাই। কোন বাধা না মানিয়া কাল তাহার স্নেহের আধার জননীকে লইয়া মহা-প্রয়াণ করিল। সেই একদিন আর এই একদিন, সে শোকে তাহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়াছিল বটে কিন্তু তথাপি আশা ছিল তাহার দাদা আছেন, তাহাকে আদর করিবার এখনও একজন বর্ত্তমান আছে—কিন্তু হায়! অবলা বাল-বিধবা আজ সে সুখেও বঞ্চিত হইতে চলিল।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—বিমলানন্দও প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধের সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি কোনও প্রকার স্বার্থান্ধ হইয়া এ সকল কার্য্য করিতেন না। ইহা তাঁহার স্বভাব সিদ্ধগুণ, অতুলধনের অধীশ্বর হইয়াও বিমলানন্দের অহঙ্কার ছিল না—নিজের স্বার্থ নষ্ট করিয়াও তিনি পরের উপকার করিতেন। ধনী দরিদ্র সকলকেই তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। জগতে বিমলানন্দের মত লোক আর কয়জন আছে? যদি থাকিত তাহা হইলে সংসার এত দুঃখময় হইত না। বৈকালে বিমলানন্দ ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া যেন কথঞ্চিৎ হতাশ হইলেন—তবে সকলের নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া বিমলানন্দকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন—অদ্য রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, না হয় কল্য দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যে মৃত্যু সুনিশ্চয়। এই কথা বলিয়া ডাক্তার মহাশয় প্রস্থান করিলেন। বিমলানন্দও বিজয়ার এত পরিশ্রম, অমানুষিক ত্যাগস্বীকার সমস্তই পণ্ড হইল। পাছে বিজয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়ে এইজন্য কোন কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না। ধীরে ধীরে শয্যা পার্শ্বে আসিয়া শ্যামাচরণের গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন। জ্ঞানী শ্যামাচরণও নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিমলানন্দের হস্তস্পর্শে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন—"ভাই বিমল! আজ তোমার বাটী যাওয়া হইবে না, এখানেই থাকিতে হইবে, আজ আমার প্রাণ যেন কেমন করিতেছে—নানাপ্রকার যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইতেছে, তুমি নিকটে থাকিলে আমি যেন অনেকটা সুস্থ থাকি।"

বিমলানন্দ বলিলেন—তাহার জন্য আর চিন্তা কি, আমি বাটীতে সংবাদ দিয়া অদ্য সমস্ত রাত্রিই আপনার নিকট বসিয়া থাকিব। ধন্য বিমলানন্দ! ধন্য তোমার পরোপকার ব্রত পালনের একান্ত অনুরাগ, তুমি মানবাকারে দেবতা; নতুবা প্রবাসে একজন অজ্ঞাতকুলশীল পরিবারের প্রতি তোমার এত সহানুভূতি কেন? বিমলানন্দ বাটীতে সংবাদ দিয়া বিজয়া ও নিজের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। বিজয়ার আহারে অনিচ্ছা থাকিলেও বিমলানন্দের কথা অবহেলা করা তাহার সাধ্য নয়, অগত্যা তিনি বিমলানন্দের আহারাদির পর যৎসামান্য জলযোগ করিলেন।

সন্ধ্যার পর হইতে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে লাগিল। বিমলানন্দ ও বিজয়া শয্যা পার্শ্বে বসিয়া মুমূর্ষুর সেবা করিতে লাগিলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় যাবতীয় মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। বিজয়া পিতামহের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিমলানন্দ বলিলেন—বিজয়া! কাঁদিবার অনেক সময় আছে, এসময় কাঁদিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলে চলিবে না;—স্থির হও। বিমলানন্দের কথা শুনিয়া বিজয়া চুপ করিলেন বটে, কিন্তু মন কি সে বারণ শুনিতে চায়?

বৃদ্ধ এইবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা যেন তাঁহাকে একটু সুস্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার জ্বলিয়া উঠে, শ্যামাচরণেরও সেই অবস্থা হইল। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বিমলানন্দকে ডাকিলেন, বিমলানন্দ নিকটে বসিলেন। তিনি তাঁহার হস্তে হস্ত প্রদান করিয়া

বলিলেন—"বিমল—ভাই! তুমি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের অনেক করিয়াছ, পুত্রেও এরূপ করিতে পারে না। ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন—তোমার পুত্র দুইটীকে নিরাময় করুন। এক্ষণে আমার একটী শেষ অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমি এখন সুখে মরিতে পারি, আমার মরণে কোনওরূপ কষ্ট হইবে না। এত ত্যাগস্বীকার করিয়াছ, আর আমার এই শেষ প্রার্থনাটী কি রক্ষা করিবে না?"

* * * *

বৃদ্ধের সে সময়কার অবস্থা দেখিলে—পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। একদিকে যম তাঁহাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য যন্ত্রণা দিতেছে, আর একদিকে পার্থিব মায়া—(বিজয়ার দশা কি হইবে) তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তজ্জন্য বৃদ্ধের যন্ত্রণার একশেষ হইয়াছে। কোমল-হৃদয় ধার্ম্মিক প্রকৃতি বিমলানন্দ বলিলেন—"বলুন একান্ত অপারক না হইলে, অবশ্যই আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব।"

বৃদ্ধ তখন আপনার বংশ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন—পরিশেষে বিজয়ার বিষয় বলিতে বলিতে অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ও উপাধান ভাসিতে লাগিল। বৃদ্ধ বলিলেন—"ভাই বিমল! আর সময় নাই; তোমার ন্যায়—ধার্ম্মিকের কথা ও কাজ একই; আমি আজ ৪ বৎসর তোমার চরিত্র দেখিয়া আসিতেছি; অতএব এই অনুরোধটী রক্ষা কর এত উপকার করিয়াছ, এক্ষণে আমার এই শেষ প্রার্থনাটী পূর্ণ করিয়া আমাকে সুখে মরিতে দাও।

বিমলানন্দ বৃদ্ধের উচ্চবংশের পরিচয়, তাঁহার পরিণাম ও উপস্থিত অবস্থা দর্শন করিয়া নীরবে অশ্রুমুচন করিয়া বলিলেন —"তাহাতে যদি আপনি সুখী হন, তবে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলাম।" মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ যেন দ্বিগুণ বলশালী হইলেন; বিমলানন্দের কথা শুনিয়া তাঁহার নিষ্পন্দ নয়নদ্বয় কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বলিল—"সাধু সাধু, আমার আশীর্ব্বাদে জগতে তোমার সমস্ত ধর্ম্মই অর্জ্জন হইবে।" পরে বিজয়ার হস্ত লইয়া বিমলানন্দের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন—"আজ হইতে বিজয়া তোমার হইল।" বিজয়ার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন—"বিজয়া তোমার জীবনদাতা প্রভুর পদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও, ইনিই তোমার দেবতা।" আনন্দের আধিক্য হইলেও সময়ে সময়ে জীবন নাশ হইয়া থাকে, শ্যামাচরণ দুর্ব্বল হৃদয়ে এ আনন্দবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না, হঠাৎ শ্বাস রোধ হইয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন। বিজয়া—"দাদাগো আমার কি হ'লো গো" বলিয়া ধূলায় পড়িয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। বিমলানন্দও অজস্র অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে ভাবিয়া, তিনি বৃদ্ধের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার জন্য তৎপর হইলেন। পূর্ব্বেই তিনি লোকজনের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই সকলে পরকাল-সম্বল হরিধ্বনি দিয়া শব শ্মশানে নীত করিলেন। চিতা রচনা হইলে, তদুপরি শব স্থাপন করিয়া অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। অগ্নি ভীষণ ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া অচিরকাল মধ্যেই সমস্ত

ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। মহেশপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের শেষ পুরুষের অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

বিমলানন্দ নিজের প্রতিজ্ঞামত শোকাতুরা বিজয়াকে আর মহেশপুরে না রাখিয়া মুঙ্গেরে লইয়া গেলেন। মহেশপুরের বাটীতে আর কেহ রহিল না, বাটীখানি আবদ্ধাবস্থায় পড়িয়া রহিল।

উপসংহার।

ধার্ম্মিক বিমলানন্দ বৃদ্ধ শ্যামাচরণের শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধের শ্রাদ্ধ করিবার কেহ না থাকিলেও, মহেশ-পুরে যথা বিধানে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আজ মাসাবধি হইল তিনি পুত্র দুইটী ও বিজয়ার সহিত দেশে আসিয়াছেন। বহুদিনের পর কাঞ্চনপুরে আসিলে—প্রজাবর্গ ধার্ম্মিক জমীদারের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। এখনও বিজয়ার সহিত তাহার বিবাহ হয় নাই; পাছে বিজয়ার কোনওরূপ মনোকষ্ট হয়, অথবা তাহাতে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, এই জন্য তিনি বিজয়ার সহিত কাশীধামে গুরুগৃহে গমন করিলেন। অভয়ানন্দ স্বামী প্রিয়শিষ্য বিমলানন্দকে দেখিয়া নিজের ও জমীদারীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিমলানন্দ গুরু-দেবকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বিষয় বলিলেন। বিজয়াকে বিবাহ করিতে যে তিনি বৃদ্ধের নিকট সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন।

বিমলানন্দ যে বিজয়ার জীবনদান করিয়াছিলেন তাহা তিনি জানিতেন; সে দিন তিনি নৌকাযোগে মহেশপুরে না আসিলে তাহার জীবন রক্ষা হইত না। বিজয়ার বিষয় আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া তিনি বিজয়াকে বিবাহ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সেই পুণ্যক্ষেত্র ৺কাশীধামে শ্রীগুরুর অনুমতি লইয়া বিমলানন্দ বিজয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। এতদিন যাহারা

প্রাণে প্রাণে সংবদ্ধ হইয়াও এক সুত্রে গ্রথিত হইতে পারে নাই—আজ বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার সম্বন্ধে, অভয়ানন্দ স্বামী দ্বারা তাহাদের মিলন সুখ সঙ্ঘটিত হইল। মাধবীলতা আজ তমালে বিজড়িত হইল। শ্যামাচরণ স্বর্গ হইতে এ মিলন দেখিলেন কি না আমরা বলিতে পারি না। এস, প্রিয় পাঠক! আমরা মঙ্গলময়ের নিকট এই ধার্ম্মিক দম্পতীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া অশ্রুকার মত বিদায় গ্রহণ করি।

প্রায়শ্চিত্ত।

প্রায়শ্চিত্ত ।
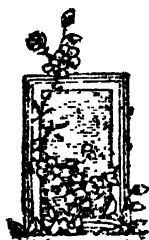
গোপালপুরে হরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় একজন মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ। ব্রাহ্মণের অল্পবয়সে স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায়, প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র নলিনীকান্ত স্বত্বেও তিনি সংসার অচল হয় দেখিয়া পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী মানদা সুন্দরী নলিনীকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন, একদিনের জন্যও সপত্নী পুত্র বলিয়া তাঁহাকে অযত্ন বা অস্নেহ করেন নাই। প্রাণপণ যত্নে তাঁহাকে শৈশব হইতে যুবা করিয়াছেন—তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন—তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন, কোনও বিষয়ে কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। মানদার একটী মাত্র পুত্র সতীকান্ত—বয়স দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার আর কোনও পুত্র কন্যা হয় নাই; কাজেই বালক সতীকান্ত পিতা-মাতার বড় আদরের। যেটী বড় যত্নের—বড় আদরের, বিধাতার সৃষ্টিতে সেইটীই বুঝি তেজহীন মলিন হইয়া যায়, তাই সতীকান্ত চিররুগ্ন, একটী দিনের জন্যও তাহার স্বাস্থ্য ভাল নহে, কাজেই লেখাপড়ার বিষয়েও সতীকান্ত তাদৃশ উন্নতি করিতে পারেন নাই। তিনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী অবধি পাঠ করিয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য হেতু বিদ্যাশিক্ষায় একপ্রকার জলাঞ্জলি দিয়াছেন। নলিনীকান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এফ, এ, পড়িতে-

ছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বড় মন্দ নহে, পরিশ্রম করিতেও নলিনীকান্ত বিশেষ পারদর্শী। দুই ভাইয়ে বড়ই সদ্ভাব—উভয়ের মধ্যে কোনওরূপ মনোমালিন্য নাই, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া একদিনের জন্যও তাঁহাদের মনে কোন প্রকার হিংসা বা ঈর্ষার উদয় হয় নাই। যেন দুইটী এক মায়ের গর্ভজাত সন্তান; একবৃন্তে দুইটী পুষ্পের ন্যায় একটী অবসাদগ্রস্ত হইলে অপরটী অবসাদগ্রস্ত ও মলিন হইয়া থাকে। নলিনীকান্ত কলিকাতায় থাকেন, সময়ে বাটী আসেন। সতীকে লইয়া কত আদর করেন—তাহার শারীরিক উন্নতি অবনতির কথা জিজ্ঞাসা করেন, আবশ্যক হইলে কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার ঔষধ পাঠাইয়া দেন। সতীকান্তের সুস্থ সংবাদ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে দেখিলে নলিনীকান্ত বড়ই সুখানুভব করিয়া থাকেন। নলিনীকান্ত অবসর ক্রমে যে কয়দিন গৃহে আসিয়া থাকিতেন, সেই কয়দিন মানদা তাহাকে নানাপ্রকার ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। মানদা বলিতেন আহা বাছা আমার পরের বাসায় থাকে ইচ্ছামত খাইতে পায় না এই জন্য নলিনী বাটী আসিলেই জিজ্ঞাসা করেন—বাবা! যে কয় দিন বাটীতে থাকিবে তোমার যে যে দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইবে, আমাকে বলিও তৎক্ষণাৎ আমি প্রস্তুত করিয়া দিব। মানদার গুণে হরেন্দ্র নারায়ণের সংসার শান্তির আগার, একদিনের জন্যও তথায় অশান্তি প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। মানদা যে নলিনীর বিমাতা তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইত না; গর্ভধারিণীর নিকটও এমন আদর যত্ন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া হরেন্দ্রকেও

কোনও প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই, একদিনের জন্যও কোন বিষয় লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামান্য বচসা মাত্র হয় নাই। মানদা সবংশের কন্যা বলিয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া সংসার করিতেন তাই অল্প দিনের মধ্যে ভাঙ্গাহাটে আবার লোক সমাগম হইয়াছে, দুঃখের সংসারে আবার সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছে।

হরেন্দ্রনারায়ণ যে সময়ে দ্বিতীয় পক্ষের সংসার পাতিয়াছিলেন; সে সময় তাহার বয়স সবেমাত্র ২৫ বৎসর। এ বয়সে তাহার বিবাহ অসঙ্গত হয় নাই। কাজেই মানদা স্বামীকে ক্রীড়া-পুত্তলী মনে করিয়া কোনরূপ বীভৎস অভিনয় করেন নাই, মানদা সদ্বংসের বিদূষী কন্যা—সকল দিক বজায় রাখিয়া সংসার পরিচালিত করিতেন। একদিনের জন্য হরেন্দ্র নারায়ণকে সহধর্ম্মিণীর প্রখর স্বভাবের জন্য মনোকষ্ট বা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই, বা তাঁহার মানের দায়ে "দেহি পদ পল্লব মুদারং" বলিয়া করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হয় নাই। এইজন্য সংসারে তাহার সুখ-শান্তির অবধি ছিল না। অধুনা দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ লইয়া আমাদের সমাজে প্রায়ই যেরূপ কলহ বিবাদ হইয়া থাকে; হরেন্দ্রনারায়ণ ও মানদা দ্বারা সংসারে সেরূপ বিবাদ বিসম্বাদের রেখাপাতও হয় নাই। হিন্দু-ধর্ম্মের চির প্রথানুসারে হরেন্দ্র নিজের স্বামীত্ব বজায় রাখিয়া স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করিতেন, মানদাও আপন স্ত্রীত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দাসীরূপে তাঁহার অনুগমন করিতেন। উভয়ের মধ্যে এই ভাবের অভাব হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের সংসারে চিরশান্তি

বিরাজিত হইয়াছিল। যে দেখিত সেই বলিত—যদি সংসারে থাকিয়া প্রকৃত সুখভোগ কেহ করিয়া থাকে, তবে সে হরেন্দ্র ও মানদা, এমন পবিত্র ধর্ম্মের সংসার আমরা আর কোথাও দেখি নাই। দ্বিতীয় পক্ষের দার পরিগ্রহ করিলে সকলেই প্রায় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন—ইহা প্রায় সকল গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পুণ্যাত্মা হরেন্দ্রের ভাগ্যে যে তাহা ঘটে নাই, তাঁহাকে যে সেই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার তিলমাত্র অনুভব করিতে হয় নাই, এজন্য এখন তিনি ভগবানকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এখন তাঁহাদের বয়স হইয়াছে; আর কোনও প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। এখন তাঁহাদের অন্তরে বাহিরে সুখের তরঙ্গ খেলিতেছে। সে তরঙ্গে পড়িয়া সোণার সংসার হাবুডুবু খাইতে লাগিল। বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে সমুদ্ভূত দুই প্রাণী একত্রে মিলিয়া মিশিয়া হাসি খেলায় দিন কাটাইতে লাগিল।

২

হরেন্দ্রনারায়ণের সংসার এখন বেশ সুখে সচ্ছন্দে চলিতেছে। সংসারের মধ্যে হরেন্দ্রনারায়ণ, মানদা, বড় বৌ (নলিনীকান্তের স্ত্রী বিমলা) সতীকান্ত, একটী ঝি ও তাহার একটী পুত্র, নাম রামদাস। রামের মা বহুদিন হইতে এই সংসারে দাসীত্ব করিতেছে। পুত্র রামদাসের সহিত সে আজ প্রায় আঠার বৎসর হইল এই সংসারে কাটাইল, এই জন্য সংসারে তাহার মায়া মমতা অধিক। নলিনীকান্তের বয়স বাইশ বৎসর, সে কলিকাতার কলেজে এফ, এ পড়ে; আর সতীকান্ত ১৬ বৎসরে

পদার্পণ করিয়া, সে গ্রাম্য বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন শেষ করিয়াছে। লেখা পড়ায় তাহার তত মেধা নাই, বাল্যকাল হইতেই তাহার শরীর রুগ্ন—স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে। এই জন্য হরেন্দ্রনারায়ণ সময়ে সময়ে লেখাপড়ার জন্য তাড়না করিলে, নলিনীকান্ত বলিতেন—'বাবা! সতীকে লেখাপড়ার জন্য কিছু বলিবেন না—ও বাঁচুক, তাহার পর লেখাপড়া, আর যদি লেখাপড়া ভাল শিখিতে নাই পারে, তাহা হইলে কি চাট্টি খাইতে পাইবে না? বিষয় পত্র না হয় সমস্ত উহারই নামে লিখিয়া দিবেন।" উদার প্রকৃতি নলিনীর কথায় হরেন্দ্র ও মানদা যেন স্বর্গ হাতে পাইতেন। তাহার ভ্রাতৃ-ভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত, তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিত। বড় বৌ কেবল এই কথায় মরমে মরিয়া যাইত, মনে মনে স্বামীকে কত তিরস্কার করিত। বিমলা বড় ঘরের মেয়ে, তাহার চাল চলন যেন কেমন এক রকমের—সে ধনী পিতার একমাত্র কন্যা বড় আদরের, তাই গৃহ-কর্ম্ম সে কিছুই শিখে নাই, কেবল পুস্তক পড়িয়া, উল বুনিয়া সময় কাটাইত। মানদার তাহা সহ্য হইত না। গৃহস্থের বৌ বিবিয়ানা শিক্ষা করিলে চিরকাল কষ্ট পাইবে। স্ত্রীলোক যে কাজ শিক্ষা করিলে সংসার উজ্জ্বল করিবে, যে শিক্ষার বলে সংসারে লক্ষ্মীর শ্রী আনয়ন করিতে পারিবে, সমস্ত ফেলিয়া সেইরূপ শিক্ষা লাভ করাই একান্ত শ্রেয়। মানদা বধূকে অহরহ সেইরূপ শিক্ষাই প্রদান করিতেন। বিমলার তাহাতে মন যাইত না। ধনীর কন্যা—আবাল্য শিক্ষিতা, কাজে কেমন করিয়া জলাঞ্জলি দিবে। তাহাকে ত আর খাটিয়া খাইতে হইবে না যে, এই সকল

সুসভ্য কাজ ছাড়িয়া অসভ্য কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিবে। কাজেই সময়ে সময়ে শাশুড়ীর সহিত তাহার মতদ্বৈধ হইত কিন্তু সুনিপুণা গৃহিণীর নিকট এক স্বামী ভিন্ন আর কাহার প্রতিপত্তি খাটিত না, তিনি পুত্রবধুকে গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিতে ছাড়িতেন না। বিমলা কি করিবেন—অনিচ্ছা স্বত্তেও দুই একটি কাজ করিতেন কারণ এখন ত তিনি স্বাধীনা হন নাই? সময়ে সময়ে গৃহকর্ম্মের জন্য শাশুড়ী বধুতে সামান্য কলহও হইত, কিন্তু মানদা বধুর সে দোষ ধরিতেন না, তিনি আপনার কর্ত্তব্য কাজ করিতেন। তিনি বধুকে লইয়া এমন ভাবে সংসার করিতেন যে, কেহ তাহাদের মধ্যে একদিনের জন্য কলহ দেখিতে পাইত না। গৃহের কথা বাহির হইতে না দেওয়াই তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ ছিল। প্রতিবাসী রমণী সকল এইজন্য মানদাকে বড়ই মান্য করিত, তাঁহার গৃহিণীপনায় সকলে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লক্ষ্মী আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। আমরা বলি মানদার ন্যায় গৃহিণী যে গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী, সে গৃহ ত বাস্তবিকই লক্ষ্মীর আবাসভূমি, চঞ্চলা যে সদাই তথায় স্থিরা হইয়া গৃহের মঙ্গল বিধান করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? হরেন্দ্র বাবুকে সংসারের বৃথা চিন্তা লইয়া তিলমাত্র কালক্ষেপ করিতে হয় না। তিনি আপন পারত্রিক চিন্তাতেই দিন যামিনী অতিবাহিত করেন। এইরূপ শান্তিময় সংসার পাইলে মানবকে বাস্তবিক পরকাল চিন্তায় বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গহণে যাইতে হয় না। মানব অনায়াসেই এই সংসারে থাকিয়া ভোগ মোক্ষ করতলগত করিতে পারে। মানদা প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া শিবপূজায় বসিতেন।

পুজা শেষ হইলে স্বামীর পাদোদক পান করিয়া সকলকে তৃপ্তির সহিত আহার করাইতেন। অতিথি ফকির আসিয়া অন্নপ্রার্থী হইলে তাহারাও বৈমুখ হইত না, মানদা অন্নদানে তাহাদেরও পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া, আপনি স্বামীর প্রসাদ লাভে পরিতৃপ্ত হইতেন। এইত তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল, এখন রমণীগণ এই ভাবে সংসার পরিচালন করিতে পারেন কি? পারেন না বলিয়াইত হিন্দুর পবিত্র সংসারে দিন দিন এত দুর্গতি বাড়িতেছে।

নলিনীকান্ত যখন বাটী আসিতেন—পিতামাতার আদর, কনিষ্ঠের ভালবাসা এবং স্ত্রীর সোহাগে কয়েকদিন সুখে কাটাইয়া পুনরায় প্রবাসে গমন করিতেন। প্রবাসে অবস্থান কালীন আধুনিক সভ্যতা স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় পত্রের আদান প্রদান মানদার নিকট বড়ই অপ্রিয় বলিয়া বোধ হইত। এই জন্য পুত্রকে এ বিষয় তিনি বারবার নিষেধ করিতেন। পত্র লিখিতে হয় বাটীর কর্ত্তাকে লিখিও, তিনি তাহার কর্ত্তব্য করিবেন। নলিনীকান্ত কখনই জননীর অবাধ্য ছিলেন না, আবশ্যক হইলে তিনি পিতাকেই পত্র লিখিতেন। হরেন্দ্রনারায়ণও যথাসময়ে সংসারের মঙ্গলামঙ্গল পুত্রকে জ্ঞাপন করিতেন। সংসার একটী ক্ষুদ্র রাজত্ব; কর্ত্তা ও কর্ত্রী ইহার রাজা ও রাণী, পোষ্যবর্গ ইহার প্রজা; নিয়মিতরূপে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এখানেও হইয়া থাকে। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই সংসার ছারখার হইয়া যায়। এইরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল বলিয়াই গোপালপুরে এই আদর্শ সংসারটীর এরূপ সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল। অন্যথা

হইলে এ সাধের বাগান এত নয়ন-মনোহর শোভায় সুশোভিত হইত না; এ সাজান বাগান এতদিন শুখাইয়া শ্মশানে পরিণত হইত।

৩

সুখ চিরকাল সমভাবে থাকে না। আজ কয়েক বৎসর সুখের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে হরেন্দ্রনারায়ণের ভাগ্যচক্র হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সতীলক্ষ্মী মানদা বিসূচিকা রোগে আক্রান্তা হইয়া কালগ্রাসে নিপতিতা হইলেন। মানদার মৃত্যুর পর হইতে হরেন্দ্র বাবু সংসারের যাবতীয় সুখ হইতে এক প্রকার বঞ্চিত হইলেন। স্ত্রীই সংসারের লক্ষ্মী, স্ত্রী বিয়োগ হইলে সংসারী পুরুষের বৃদ্ধ বয়সে যে কি কষ্ট তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। মানদা হরেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হইলেও তাঁহাদের ভিতর কোন প্রকার কলহ বিবাদ সংঘটিত হয় নাই; স্ত্রীর পীড়নে একদিনের জন্যও তাঁহাকে মর্ম্ম পীড়া অনুভব করিতে হয় নাই। হরেন্দ্র নারায়ণ এতদিন সংসারের অভাব অভিযোগ কিছুই জানিতে পারেন নাই। সামান্য জমীদারী হইতে যাহা আয় হইত, এবং তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন—সমস্তই মানদার হাতে আনিয়া দিতেন, মানদা তাহার দ্বারা এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার চালাইতেন যে একটী ধনী-গৃহস্থের বাটীতেও সেরূপ সুখ ও শান্তির একত্র সমাবেশ প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না।

হরেন্দ্রনারায়ণ স্থানীয় জমীদার—ভবনে নায়েবের কার্য্য করিতেন, বেশ দুই পয়সা আয় ছিল। দুই পয়সা আয় ছিল বলিয়া

যে তিনি প্রজাপীড়ন করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেন—তাহা নহে। দুস্থ প্রজাবর্গের উপকার করিয়া দিতেন,—তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা জমীদারের কর্ণগোচর করিয়া তাহাদের কর-ভার লাঘব করিয়া দিতেন; এই জন্য প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট হইয়া যাহার যেমন ক্ষমতা তাঁহাকে কিছু কিছু প্রদান করিত, কেহ কিছু দিতে না পারিলেও তিনি উপকার করিতে ছাড়িতেন না। জমী-দার মহাশয় ও তাঁহার সৎস্বভাবের জন্য তাহাকে সময়ে সময়ে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। গৃহিনী মানদা সেই অর্থে সামঞ্জস্য ভাবে সংসার চালাইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর হরেন্দ্রনারায়ণ এক প্রকার উদাস হইয়া গিয়াছেন, সংসার-ধর্ম্মে আর তাঁহার তাদৃশ আশক্তি নাই। সংসার চলুক আর নাই চলুক, এখনও অধিকাংশ সময় তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পারত্রিক কাজে অতিবাহিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সংসার আর তেমন চলে না। সবই আছে,—সেই আয়, সেই ঘর বাড়ী, সেই লোকজন কিছুরই অভাব হয় নাই। কেবল একের বিহনে সে সংসারে কেমন একটা বিসদৃশ বিশৃঙ্খলতা ধীরে ধীরে উকি মারিতে লাগিল। হরেন্দ্রের জ্যেষ্ঠা বধু বিমলা সংসার কার্য্যে ততদূর পারদর্শিনী হইতে পারেন নাই। শাশুড়ী বর্ত্তমানে তিনি কেবল বিলাসিতা লইয়াই কাল কাটাইয়াছেন; কাজেই তাহার দ্বারা সুচারুরূপে সংসার চালান এক প্রকার দায় হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তাহার অন্তঃকরণে আবাল্য যে একটা বিদ্বেষ ভাব, হিংসার একটা তীব্র তাড়না এত দিন বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল, সময় পাইয়া তাহা প্রকাশমান হইয়া পড়িল।

এই দোষেই তাহার সমস্ত মাটি হইতে লাগিল, কিছুতেই সংসারের পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য আর ফিরিয়া আনিতে পারিল না। যে অনল ধীরে ধীরে প্রজ্জলিত হইতেছে, কালে ইহা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসার নষ্ট না করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে না।

নলিনীকান্ত এখন আর কলিকাতায় থাকেন না। এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাতৃবিয়োগের পর গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। পিতা নামমাত্র আছেন, সংসারে তাহার অশান্তি নাই। পুত্র দুইটীকে উপযুক্ত দেখিয়া তিনি সমস্ত ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এখন নলিনীকান্ত বাটীর কর্ত্তা আর বিমলা কর্ত্রী পদে অধিষ্টিতা হইয়া হরেন্দ্রের সংসার পরিচালনা করিতেছেন। সতীকান্ত দাদা ও বৌদিদির কথায় কখন প্রতিবাদ করিতেন না, তাহাদের কাজ কর্ম্মের সমালোচনা করিতে সতীকান্ত জানিতেন না। তাহার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে দাদা ও বৌদিদি যাহা করিবেন—তাহার উপর আর কথা কি? তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহার ভালই করিবেন, মন্দ করিবেন না। নলিনী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন, পাঠক! তাহা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। নলিনী সতীকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। ভ্রাতার সহিত একত্র বসিয়া আহার না করিলে সে দিন তাহার আহারে তৃপ্তি হইত না। বিমলা কিন্তু এ ভাব দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে চটিয়া যাইতেন। তাহাদের ভাব দেখিয়া কেবল ভাসুর নয়নে চাহিয়া থাকিতেন—মুখ ফুটিয়া কোনও কথা বলিতে পারিতেন না। হরেন্দ্রনারায়ণকে বিরক্ত করিলে যা তাঁহার জীবিতাবস্থায়

সতীকান্তকে অনাদর করিলে, তাহার সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া হৃদয়বেগ সম্বরণ করিতেন।

সতীকান্ত বৌ দিদিকে মায়ের মত মান্য করিতেন, একদিনের জন্যও তাঁহাকে অমান্য করিতেন না। বিমলা কখন কোনও মর্ম্মান্তিক কথা বলিলেও তাহা পিতার নিকট প্রকাশ করিতেন না, কেবল নীরবে নির্জ্জনে দুই এক ফোঁটা অশ্রু ফেলিয়া সে হৃদয় জ্বালার উপশম করিতেন। কনিষ্ঠের প্রতি কোন রূপ অন্যায় আচরণ করিতে দেখিলে নলিনী বিমলাকে কত তিরস্কার করিতেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" বিমলা সে কথায় আদৌ কাণ দিত না।

৪

পতিব্রতা পত্নীর বিয়োগে পুরুষের অবস্থার ব্যবস্থা থাকে না। বৃক্ষে বজ্রাঘাত হইলে যেমন ঠিক সমভাবেই দণ্ডায়মান থাকে অথচ তাহার যাবতীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, পত্নী বিয়োগে পতির অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। তাহার উপর সাংসারিক নানাপ্রকার চিন্তায় স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া দেহ রোগাক্রান্ত হয়, সে রোগ আর সহজে আরোগ্য হইতে চাহে না। হরেন্দ্রনারায়ণের অবস্থা ঠিক এইরূপই হইয়াছিল।

পত্নী বিয়োগের পর তাঁহাকে নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হইতে হইল। রোগ ক্রমশঃ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিল। নলিনীকান্ত পিতার অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইলেন। আর সতীকান্ত, সে ত পিতা বই আর কিছুই জানে না। জননী চলিয়া গিয়াছেন—অকালে তাহার মাতৃসেবার আশা ফুরাইয়াছে।

আবার পিতার আশাও বুঝি ছাড়িতে হয়। এ জগতে পিতা মাতার তুল্য বন্ধু আর কে আছে। সংসার সাগরের ভীষণ তরঙ্গে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইলে পিতামাতার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন সন্তানের আর অন্য উপায় নাই। জনক জননীর সুশীতল চরণ ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, এককালে সকল যন্ত্রণার সমতা লাভ হয়। পিতামাতার স্নেহমাখা সাদর সম্ভাষণ যে কত সান্ত্বনাদায়ক, সংসার-আতপ-তাপ-তাপিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। পর্ব্বতের অন্তরালে থাকিয়া তীব্র শল্যের আঘাত হইতে যেমন অনায়াসে জীবন রক্ষা করা যায় কোন ভাবনাই থাকে না। সংসারের নানা বিভীষিকাময় দারুণ আঘাতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পুত্র দুর্ভেদ্য পর্ব্বতোপম পিতামাতার পার্শ্বে থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারে—কোন ভাবনাই থাকে না। সতীকান্তের সে সুখের অর্দ্ধেক সুখ ত বহু দিবস হইল তিরোহিত হইয়াছে। অর্দ্ধেক যাহা ছিল, যাহার চরণ সেবা করিয়া সতীকান্ত সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছিল, দুরন্ত কাল এতদিনে তাহারও মূলচ্ছেদ করিতে বসিয়াছে। বালক সতীকান্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট, তিনি কখন মুখ তুলিয়া চাহিবেন, কখন তাঁহার বিশুষ্ক মুখ-বিবরে একটু দুগ্ধ প্রদান করিবেন, বালক এই আশায় বসিয়া থাকে—তিলেকের জন্য কাছছাড়া হয় না। নলিনীকান্ত প্রত্যহ পরের চাকুরী করিতে বিদ্যালয়ে থাকেন বটে কিন্তু প্রাণ তাহার মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া থাকে। বিমলা শশুরের সেবা শুশ্রূষা করেন বটে কিন্তু তাহাও লোকনিন্দা ভয়ে স্বইচ্ছায়

তিনি এ কার্য্য করিতে পারেন না। বৃদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে লাগিল। মৃত্যুর করাল ছায়া প্রত্যেক লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এত ঔষধ, এত পথ্য কিছুতেই বাধা মানিল না। একদিন গভীর রজনীতে বাকরোধ হইয়া বৃদ্ধ হরেন্দ্রনারায়ণ ইহসংসার ত্যাগ করিলেন। পরোপকার পরায়ণ ধার্ম্মিক-প্রবর হরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইল। নলিনী ও সতীকান্তের মর্ম্মভেদী ক্রন্দন শ্রবণ করিলে অতি বড় পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়—বিশেষতঃ সতীকান্তের করুণ ক্রন্দন বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তাহার আকুলি-বিকুলি ক্রন্দন শুনিয়া কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, শব দেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। চিতাস্থ করিয়া বিধিমতে অগ্নি সংযোগ করা হইল। পুণ্যাত্মার পবিত্র দেহ উদরসাৎ করিবার জন্য অগ্নিদেব লোল জিহ্বা বাহির করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই বিশাল দেহ ভস্মে পরিণত হইল,—আর কিছুই নাই, সমস্ত ছাই হইয়া গিয়াছে। তারপর গাঙ্গিনী সলিলে দেহ পবিত্র করিয়া সকলে হরিধ্বনি করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

৫

শোক চিরকাল সমভাবে থাকে না। হরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর পাঁচ সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। নলিনীকান্ত পিতার শোক এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছেন, তবে স্মৃতি সময়ে সময়ে ব্যথা দিতে ছাড়ে না।

সংসার আর চলে না। হরেন্দ্রনারায়ণের বিষয় আশয় সমস্তই আছে, নলিনীকান্ত বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেছেন, কিন্তু সে আয়ে সংসারের সংকুলান কিছুতেই হইতেছে না। পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য, সে শান্তির পবিত্র ছায়াপাত আর এ সংসারে কিছু মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রীজাতিই সংসারের শ্রী, গৃহের আনন্দ। সংসার শ্রীসম্পন্ন করিতে হইলে স্ত্রীজাতিই মূলাধার। যথায় স্ত্রীজাতি সংসার পরিচালনে অপটু, সদাই বিলাস লালসার বশীভূত, সে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কিছুতেই হইবে না। বিমলা এখন গৃহের কর্ত্রী, সংসারের সুখ শান্তি এখন তাহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই বিলাসিতায় মত্ত, সংসারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই; অহঙ্কার ও ঈর্ষায় তাঁহার মন এত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, তিনি তাঁহার স্বামী ভিন্ন আর কাহার সংস্পর্শে থাকিতে ভাল বাসেন না। তাই সংসারে এত অশান্তি, তাই সুখের সংসার ক্রমশঃ এরূপ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। ইহার জন্য নলিনী স্ত্রীকে কত ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়া তাহার চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। বিমলা এ সকল সাধু উপদেশ মানিয়া কাজ করিতে পারে না। নলিনীকান্ত অর্থ চিন্তায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন, যে সময়টুকু গৃহে থাকেন কেবল সমস্ত দিনের কলহ বিবাদের মীমাংসা করিতেই তাহা কাটিয়া যায়। আজ দাস দাসীর সহিত, কাল সতীকান্তের সহিত বিমলা অপব্যবহার করিয়াছে। প্রত্যহ এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে নলিনী বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অন্ন কলহ

নলিনী অকাতরে সহ্য করিতে পারেন কিন্তু সতীকান্তকে যদি কেহ কটু কথা বলে তিনি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারেন না। গুরু হইলেও তিনি তাঁহার গুরুত্ব মানিতে চাহেন না, স্ত্রীত কোন ছার। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নলিনী সতীকান্তের বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন কিন্তু সতী তাহাতে কোনও প্রকারেই মত দিল না। বড় বধূর ভাব গতিক দেখিয়া বাস্তবিক স্ত্রীজাতির প্রতি তাহার কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়াছে। একদিন বিমলা অহঙ্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া সতীকান্তকে বড়ই অপমান করিল, রামের মা হাতে করিয়া সতীকে মানুষ করিয়াছে, বিমলার আজিকার দুর্ব্যবহার দেখিয়া সে স্থির থাকিতে পারিল না। সেও কলহে যোগ দিল, সতী কিন্তু তাহাকে নিষেধ করিল বলিল—"মাসি! বৃথা কলহে আবশ্যক কি? আজ হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর উহার অন্ন-জল ছুঁইব না। তবে তাঁহার অপমান করা কখন উচিত নয়।" এই বলিয়া রামের মার হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন।

সমস্ত দিনের পর নলিনী গৃহে আসিয়া সকল কথা শুনিলেন —তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—আমিও আর উহার হাতের অন্নজল স্পর্শ করিব না। এই বলিয়া সেদিনের মত জলযোগ করিয়া দুই ভ্রাতায় বহির্বাটীতে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। নলিনী-কান্তের ভয় পাছে সতী এই সকল জ্বালায় অভিভূত হইয়া গৃহত্যাগ করে, তাহা হইলে নলিনী কেমন করিয়া গৃহে থাকিবেন তিনি সতীকে যে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না; এইজন্য তিনি সমস্ত রাত্রি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কত বুঝাইলেন, বলিলেন—

"তোমার আর গৃহে আহারাদি করিয়া কাজ নাই তোমার ও আমার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিব। তবে উহাকে ত্যাগ করিবার ত উপায় নাই, হঠাৎ কোনরূপে কলঙ্কিত হইয়া আমাদের পবিত্র কুলে কালি দিতে পারে। এইজন্য উহাকে অন্য কোনও প্রকার শাস্তি দিতে পারি না, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির গাত্রে হাত তুলিতে নাই। আমি কল্য তোমার জন্য ব্রাহ্মণ বন্দোবস্ত করিয়া দিব এবং উভয় ভ্রাতায় মনের সুখে বহির্বাটীতে থাকিব।" এইরূপ সমস্ত রাত্রি সতীকে বুঝাইয়া নলিনী রজনী শেষে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সতীর নিদ্রা নাই। সে দাদার মহাপ্রাণতার বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে মনে শতবার ধন্যবাদ দিতে লাগিল। আরও ভাবিতে লাগিল— "আমার উপরই বৌদিদির আক্রোশ কিছু বেশী, বিষয়ের অংশ দিতে হইবে বলিয়া তিনি আমার মৃত্যু কামনা করেন। আমি গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইলে বোধ হয় তিনি শান্ত শিষ্ট হইতে পারেন—তাহা হইলে আমার এই দেবোপম ভ্রাতার আর কোনও কষ্ট হয় না, অতএব গৃহ পরিত্যাগ করাই আমার কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আমাদের এই পবিত্র সংসারে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, দাদা আমার পুনরায় সুখী হইতে পারেন। তবে আমি এখানে থাকিয়া কেন দাদার সুখ-পথের কণ্টক হই। যাহা হউক, দাদা ত নিদ্রিত হইয়াছেন—এইত সময়, এইবার যে দিকে দুইচক্ষু যায়—চলিয়া যাই। সহায় ভগবান, ভগবান দাদাকে রক্ষা করিও, তাঁহার মনে শান্তি দান করিও।" এই বলিয়া সতী চিরজীবনের মত দাদার পদধুলি গ্রহণ করিয়া সেই

ঘনান্ধকারময়ী নিশীথ সময়ে গৃহত্যাগ করিল। কেহ জানিতে পারিল না, সতী নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল। সেই সূচী-ভেদ্য ঘনান্ধকারের ভিতর হইতে যেন সতীকান্ত দেখিতে পাইল—তাহার দেবোপম দাদার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তার গৃহত্যাগ বিষয় জানিতে পারিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছে, "সতি! ভাই জাসনে ফিরে আয়! ফিরে আয়!" সতী আর ফিরিল না সে দ্রুতপদে অন্ধকার ক্রোড়ে মিসাইয়া গেল। পিতার মৃত্যুর পর সে যাহা কৃতনিশ্চয় করিয়াছিল, আজ নির্ভীকচিত্তে তাহাই প্রতিপালন করিতে অগ্রসর হইল। ভগবান তাহার সহায় হউন। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের পক্ষীগণ যেন তাহার গমনে বাধা দিবার জন্য সেই রজনী শেষে কলরব করিয়া উঠিল। দুই একটী গৃহপালিত সারমেয় দুই একবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল। ধার্ম্মিকবর সতীকান্তের গৃহত্যাগবার্ত্তা জ্ঞাপন করাই বুঝি তাহাদের এই চীৎকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু কেহ সাড়া দিল না দেখিয়া তাহারাও নীরব হইল। সংসারে বীতরাগ, মহামতি গৌতম শাক্যসিংহের ন্যায় সতীকান্ত সংসারে বীত-শ্রদ্ধ হইয়া অন্ধকার রজনীর গভীরতা ভেদ করিয়া ভীষণ গহ্বরে প্রস্থান করিলেন।

৬

ক্রমে রজনী অবসান হইল। ঘনান্ধকার পরিপূর্ণ যামিনীর অপগমে বালার্কের লোহিত কোমল রশ্মি জগতকে পুলকিত করিতে লাগিল। সকলেই আবার মনের আনন্দে পরিজন পরিবৃত হইয়া সংসার ধর্ম্মে পরিলিপ্ত হইল। সমস্ত রাত্রি

অনিদ্রা হেতু নলিনীর উঠিতে একটু বেলা হইল—তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলে, প্রভুভক্ত রামদাস এক কলিকা তামাকু সাজিয়া দিল। নলিনী ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রামদাস! সতী কি পড়িতে গিয়াছে?"

রামদাস। ছোট বাবুকে আমি সকাল হইতে দেখি নাই। তিনি ত কাল রাত্রে আপনার কাছেই ছিলেন?

নলিনী। ছিল বটে, কিন্তু সে সকালে উঠিয়া কোথায় গেল?

রামদাস। আমিত সে বিষয় বলিতে পারি না, তাঁহাকে সকালে দেখিতে না পাইয়া মনে করিয়াছিলাম—তিনি এখনও আপনার নিকট ঘুমাইতেছেন।

নলিনী ভ্রাতাকে না দেখিয়া এবং ভৃত্যের মুখে কোনও সংবাদ না পাইয়া মনে মনে সন্দেহ করিলেন। সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি বাটীর ভিতর গমন করিলেন এবং সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিল—"তাহারা প্রাতঃকাল হইতে সতীকে বাটীর ভিতর আসিতে দেখে নাই।" নলিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। গতকল্য রজনীতে ভ্রাতার মতিগতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি এক-প্রকার সন্দেহ করিয়া ভ্রাতাকে কাছে লইয়া শয়ন করিয়া ছিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি নানাবিধ উপদেশ দানে তাহার চিত্ত-বিকার নাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছেন—সে সমস্ত বৃথা হইয়াছে। সতী নিশ্চয়ই গৃহ-ত্যাগ করিয়াছে। তিনি চারিদিকে লোক পাঠাইলেন—রামদাস

ছোট বাবুকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, সে ছোটবাবুর গৃহ পরিত্যাগের কথা শুনিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। নলিনীকান্ত প্রাণের আবেগে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন আর অন্বেষণ করা বৃথা—সতী এতক্ষণ কোন দিকে কতদূর গিয়াছে—তাহার স্থিরতা নাই। সকলেই ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিল। নলিনী হতাশ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। পাঠক! নলিনীর ভ্রাতৃস্নেহ কতদূর প্রগাঢ় দেখুন, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য এত দুঃখ, এখন কিন্তু সহোদর ভ্রাতার জন্য কেহ এরূপ করেন কি না সন্দেহ। সতীকে সকলেই ভালবাসিত, তাহার অদর্শনে সকলেই কাতর হইল। সুখী হইল কেবল বিমলার, সে মৌখিক যদিও দুঃখ প্রকাশ করিল কিন্তু বিষয়-ভোগ নিষ্কণ্টক হইবে ভাবিয়া মনে মনে যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিল। যাহার জন্য সে অহরহঃ সতীর সহিত কলহ করিত, যাহাকে বাটী হইতে তাড়াইতে পারিলে সে সুখে রাজ্যভোগ করিবার অবসর পায়—আজ সে স্বইচ্ছায় গৃহত্যাগ করিল, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদে নলিনীকান্ত সংসার অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কোন কার্য্যই এখন তিনি মনোযোগের সহিত করিতে পারেন না, কিছু তাঁহার ভাল লাগে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিয়াছেন, জমিদারীর আয়ে এখন এক প্রকার কষ্টে সংসার চলিয়া যায়। সতীকান্তের গৃহত্যাগের পর তাঁহার স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছেন।

এখন তিনি অন্তঃপুর মধ্যে প্রায়ই প্রবেশ করেন না, বহিঃর্বাটিতে সদাসর্ব্বদা কালযাপন করেন। আহারের সময় পাচিকা তাহার আহার্য্যীয় আনিয়া দেয়। এখন প্রভূভক্ত রামদাসই তাঁহার সঙ্গী হইয়াছে। তিনি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন—'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গৃহিনীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট'. হয়, এ প্রবাদ বাক্যটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল-চরিত্র, সাধু-প্রকৃতি পুরুষের সহিত বিমলার ন্যায় চরিত্রহীনা রমণীর পরিণয় বন্ধন কখন ঠিক হয় নাই; তবে হরেন্দ্রনারায়ণ সুশ্রী ও বড় গৃহের কন্যা বলিয়া ভ্রমক্রমে বিমলাকে বধুরূপে গৃহে আনিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন—পুত্রটীর অনুরূপা পাত্রী না হইলে শেষে মিলনে কোন রূপ মনোমালিন্য উপস্থিত হয়—এই জন্য তিনি এ কার্য্য করিয়াছিলেন, আর বিধাতাও এ মিলনের কর্ত্তা, নতুবা এ বিবাহ কখনই এরূপ ভাবে সম্পাদিত হইত না।

প্রায় একবৎসর অতীত হইল, সতীকান্তও গৃহে প্রত্যাগমন করিল না, ভার্য্যাও মনের মত হইল না; অহঃরহঃ কেবল সংসারে অশান্তির অনল ধূমায়িত হইতে লাগিল। শান্তি-প্রিয় নলিনীর সংসারে সং সাজিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনিও তীর্থ ভ্রমণের মানস করিয়া একদিন গভীর নিশীথে গৃহত্যাগ করিলেন।

এতদিন পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসার প্রকৃত শ্মশানে পরিণত হইল। প্রলয়ঙ্করী স্ত্রী বুদ্ধিই এই পবিত্র সংসার শ্মশানে পরিণত করিবার একমাত্র কারণ।

প্রায়শ্চিত্ত।

মলিনীর সংসার পরিত্যাগের পর বিমলা দুই একদিন সামান্য পরিমাণে দুঃখিতা হইয়াছিল, কিন্তু সে ভাব তাহার অন্তরে বেশীদিন স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এখন বিষয়াদির সমস্ত ভার বিমলার, সে এখন যথেচ্ছা অর্থাদির অপব্যয় করিতে লাগিল। সংসারে অর্থ ও বিষয়ের লোভ সম্বরণ করিতে পারে এতাদৃশ লোক অতি বিরল। অর্থের জন্য কুকার্য্য করিতে সকলেই অগ্রবর্ত্তী, বিমলাকে একাকিনী পাইয়া অনেকেই তাহার নিকট হইতে অর্থাদি ভুলাইয়া লইবার সুপন্থা অন্বেষণ করিতে লাগিল। এক্ষণে বিমলাকে সৎপথে রাখিয়া তাহার বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহাকে সদুপদেশ দিয়া পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন, এমন লোক আর কেহই নাই। শ্বশুর কুল ও পিতৃকুল উভয়ই শূন্য। দাস দাসী তাহার মুখের দোষে পলায়ন করিয়াছে। যুবতী স্ত্রীলোক অভিভাবকবিহীন হইলে তাহার চরিত্র রক্ষা করা বড়ই কঠিন। দিন দিন বিমলার চরিত্র কলঙ্ক-কালিমায় মলিন হইতে লাগিল। আজ কাল প্রতিবাসী কোন ভদ্র গৃহস্থের সহিত তাহার সদ্ভাব নাই। সময়ে সময়ে তাহার পিত্রালয় হইতে দুই একজন দূরসম্পর্কীয় চরিত্রহীন যুবক তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। বিমলার যৌবন তরঙ্গিনীতে এখনও ভাটা পড়ে নাই ; তাহার উপর বিমলা নিঃস্ব নহে, অর্থ কিছু আছে। এ অবস্থায় রমণীর সর্ব্বনাশ সাধনের আর বিচিত্র কি ? বিমলার চরিত্র দেখিয়া পাড়ার সকলে তাহাকে সমাজে রহিত করিল। কেহ এখন

আর তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে চাহে না—কেহ তাহার বাটীতে পদার্পণ করে না। বুঝিয়া চলিতে না পারিলে—রাজার রাজ্য পর্য্যন্ত উৎসন্ন যাইয়া থাকে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয়ও অতি সামান্য—কয় দিন চলিবে? দেখিতে দেখিতে দেনার দায়ে সামান্য বিষয়টুকু লাটে উঠিল। মনোহরপুরের জনৈক জমীদার তাহা নিলামে ক্রয় করিল। এইবার বিমলা সমস্ত বুঝিতে পারিল। নিজের বুদ্ধি দোষে সুখের আশায় দুঃখের অনলে নিমজ্জিতা হইল। এখন প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকগণ তাহার সহিত কথা কহিতেও ঘৃণা করে। এইবার পাপিনীর পাপ কার্য্যের ফলপ্রাপ্তির সূত্রপাত হইল।

কিছুদিন পরে মনোহরপুরের জমীদারের লোক জন আসিয়া বাটী দখল করিল। অগত্যা বিমলাকে পথে দাঁড়াইতে হইল। হায়! হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্রবধূ; ধার্ম্মিকপ্রবর নলিনীকান্তের সহধর্ম্মিনী, আজ নিজ কর্মদোষে পথের কাঙ্গালিনী অপেক্ষাও ঘৃণিতা। ভিখারিণী বরং লোকের দ্বারস্থ হইলে একমুষ্টি ভিক্ষা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিমলা তাহা অপেক্ষাও নীচ, কাহার দ্বারস্থ হইবার ক্ষমতাও তাহার নাই। আহারের সংস্থান নাই, পরিবার বস্ত্রটুকুও ছিন্ন হইয়াছে। সে পাড়ার লোকের নয়ন পথে পতিতা হইলে আবালবৃদ্ধবণিতা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে। একদিন যে বিমলার প্রতাপে, যাহার প্রসাদ লাভের জন্য প্রতিবাসিনী রমণীগণ কত সাধ্য সাধনা করিত, এখন সেই বিমলার নাম পর্য্যন্ত কেহ মুখে আনে না। চরিত্র মানুষের এমনি অমূল্য সম্পত্তি। ইহার একটু

মাত্র বান্‌চাল হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না—লোকে তাহাকে দেখিতে পারে না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ চরিত্র বিহীন হইলে সে মানুষ নামের অযোগ্য, অপদার্থ। তাহার সংসর্গে কেহ থাকিতে চাহে না—তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেও লোকে কুণ্ঠিত হয়। বিমলার এখন সেই দশা উপস্থিত। সে দেবরকে তাড়াইয়াছে, স্বামীকে দেশত্যাগী করিয়াছে; শ্বশুরের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করিয়া আপনার চরিত্র কলুষিত করিয়াছে। স্বামীর পবিত্র কুলে কালি দিয়াছে। এ অবস্থায় তাহাকে কে দেখিতে পারিবে, কে তাহার দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবে। সে ত এখন জনসমাজের ঘৃণ্য, আবালবৃদ্ধবণিতার উপহাসের সামগ্রী, বিমলা পাড়ায় আর মুখ দেখাইতে পারিল না। কাহারও বাটীতে আশ্রয় লইতে তাহার সাহস হইল না।

অনাহারে অনিদ্রায় দুই চারি দিবস ইতঃস্তত করিয়া সে গ্রাম পরিত্যাগ করিল। শ্রীমন্তপুরে আর তাহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। পাপ বিদায় হইয়াছে দেখিয়া সকলেই সুখী হইল। কিন্তু নলিনী ও সতীকান্তের জন্য গ্রামবাসী সকলেই সময়ে সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিত। নিজে ভাল হইলে লোকে তাহার জন্য এইরূপই করিয়া থাকে। তুমি জগতের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, জগতের নিকট হইতে তুমি সেইরূপ ব্যবহার পাইবার আশা করিতে পার। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য।

৮

বিমলার গ্রাম পরিত্যাগের পর আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নলিনী ও সতীকান্তের কোন সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায়

নাই। মনোহরপুরের জমীদার এখন নলিনীকান্তের বাস্তুভিটা নিলামে খরিদ করিয়া তাহার উপর সুদৃশ্য মনোহর অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। দেবালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। আগামী শুভ বৈশাখ মাসে তাঁহারা নূতন গৃহপ্রবেশ করিবেন। নূতন গৃহপ্রবেশ করিতে হইলে হিন্দুর নিয়মানুসারে বাস্তু দেবতার পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইতে হয়। এই গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে খরচান্ত দেখিয়া গ্রামের সকলেই মনে করিল, ক্রেতা একজন বিশিষ্ট ধনবান ব্যক্তি, তবে লোক কিরূপ হইবে, তাহার সমালোচনা এখন করা যাইতে পারে না।

ক্রমে শুভ বৈশাখ মাস সমাগত হইল। গৃহপ্রবেশের দুই একদিন পূর্ব্বে তাঁহারা শ্রীমন্তপুরে আগমন করিলেন এবং শুভ কার্য্যের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বদিন রজনীযোগে কর্ত্তা গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন। ইনি গ্রামের মহাশয় ব্যক্তি, গ্রামের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ তাঁহার মতামত লইয়া সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য নবাগত জমীদার মহাশয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বার্দ্ধক্য হেতু রজনীতে ভাল দেখিতে পান না। তিনি বলিলেন—"মহাশয়! পা তুলে আসুন।"

জমীদার বৃদ্ধের কথায় ধীরে ধীরে উঠিয়া বৈঠকখানাগৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধও

নিকটে উপবেশন করিয়া নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

*　　*　　*　　*

বৃদ্ধ অনেক কথা কহিতেছেন, জমীদার যুবক কিন্তু বেশী কথা কহিতে পারিতেছেন না—তাহার বাক্য যেন জড়াইয়া যাইতেছে, কণ্ঠাবরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে। বৃদ্ধ অনুমানে বুঝিলেন—জমীদারের বোধ হয় এই শুভ কার্য্যে কোন নবীন শোকস্মৃতি মনোমধ্যে সমুদিত হইয়া তাহাকে এইরূপ কষ্ট প্রদান করিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "মহাশয়! সম্প্রতি কি আপনার কোনও বিপৎপাত হইয়াছিল, তজ্জন্য সেই স্মৃতি মনে পড়িয়া এই শুভ কার্য্যের সময় আপনাকে কষ্ট প্রদান করিতেছে?" জমীদার যুবক আর হৃদয়বেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—তিনি বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"জেঠা মহাশয়! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? আমিই আপনাদের সেই নিরুদ্দিষ্ট অধম সতীকান্ত।" বৃদ্ধ চক্ষে দেখিতে পান না, কিন্তু এইবার কণ্ঠস্বর শুনিয়া অনুভব করিলেন, নবাগত জমীদার-বেশী যুবক আর কেহই নহে আমার প্রাণের বন্ধু হরেন্দ্রনারায়ণেরই কনিষ্ঠ পুত্র সতীকান্ত। সতীকান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে, বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—"জেঠা মহাশয়! আমার দাদার দশা কি হইয়াছে বলুন, তিনি কি অবস্থায় কোথায় গিয়াছেন এবং তাহার বাস্তুভিটার এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল?"

বৃদ্ধ—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সতীকান্তকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিলেন "বাবা সতি, তোমার জন্যই তোমার দাদা কাঁদিয়া পাগল হইয়াছিলেন, শেষে পত্নীর জ্বালায় অস্থির হইয়া কোথায় গিয়াছেন, তাহার সন্ধান কেহ বলিতে পারে না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে নলিনীকান্তের ভ্রাতৃপ্রেম ও তজ্জন্য তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া সতীকান্ত বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রমানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়-নানা-প্রকারে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"বাবা! এখন ভগবানের কৃপায় তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছ; এবার তাহার অনুসন্ধান কর, যদি নলিনী জীবিত থাকে অবশ্য দেখা হইবে, পুনরায় দুই ভ্রাতায় মিলিত হইয়া সুখে সংসার করিবে। এখন ত আর সে পিশাচী নাই!" এই বলিয়া বিমলার দুর্গতির কথা সতীকান্তকে শুনাইলেন। সতীকান্ত বড় বধুর অবনতির কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর রমানাথ বাবু বলিলেন "সতি! হঠাৎ তোমার এরূপ অবস্থা পরি-বর্ত্তনের কারণ কি? যদি বলিতে কোনরূপ বাধা না থাকে বিবৃত করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত কর। তোমার পিতা জীবিত থাকিলে তিনি যেরূপ সন্তুষ্ট হইতেন, আমিও তদ্রূপ হইব।"

সতীকান্ত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আত্মকাহিনী বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। "আমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে এক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহাকে আমার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলাম, তিনি বলিলেন "বৎস! এ পথে আসিবার

এখনও তোমার সময় হয় নাই। বিষয় লালসায় এখন তোমার পরিতৃপ্তি হয় নাই। অতএব তুমি পুনরায় সংসারী হইয়া কিছুদিন দাম্পত্যসুখ সম্ভোগ ও বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হও, তার পর এই পথের পথিক হইও," তিনি আমাকে যথাবিধি দীক্ষা প্রদান করিয়া বলিলেন—বৎস! যাও আর অপেক্ষা করিও না', কিছু দিন পরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিও, তাহা হইলে তোমার সকল বাসনা সুসিদ্ধ হইবে। যদি সংসারে কোনরূপ ব্যাঘাত অনুভব কর, আমাকে জানাইও আমি তাহার প্রতিকার করিব। আমার আশীর্ব্বাদে সংসারে তুমি সকল বিষয়ে সুখী হইবে। তুমি পিতৃদত্ত বিষয়-প্রাপ্তি-বিষয়ে নৈরাশ হইয়া অকাতরে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছ; এইবার তাহা অপেক্ষা সহস্র পরিমাণে বিষয় ভোগ ও স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া সুখী হইবে. কিন্তু বৎস! সংসারে প্রমত্ত হইয়া ভগবানকে বিস্মৃত হইও না।" আমি গুরুদেবের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। দুই তিন দিনের পর মনোহরপুর আসিয়া এক জমীদারের বাটীতে অতিথি হইলাম। তখন আমার গেরুয়া বসন পরিধান মাত্র অপর কোনও সাজ সজ্জা ছিল না, আসিবার সময় গুরুদেব পথিমধ্যে ক্ষুধা নিবারণের জন্য কয়েকটী মূল প্রদান করিয়াছিলেন। তখনও তাহার দুইটী মাত্র আমার নিকট অবশিষ্ট ছিল। জমীদার মহাশয় দাতা ও পরম ধার্ম্মিক কিন্তু বলিতে পারি না কোন পাপে তিনি দুরারোগ্য শ্বাস রোগে কষ্ট পাইতে-ছিলেন। যে দিন আমি তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম সেদিন তাহার রোগের যন্ত্রণা এত বাড়িয়াছিল যে জীবন সংশয় হইবার

উপক্রম হইয়াছিল। কোনও কবিরাজ তাহার সেই শ্বাসের কষ্ট নিবারণ করিতে পারে নাই। আমি গুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া সেই মূলের একটী বাটীয়া তাহার রস পান করিতে বলিলাম, জানি না কি কুহক-মন্ত্রে সেই রস গলাধঃকরণমাত্র তাঁহার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার শান্তি হইল। যখন জমীদার মহাশয় আমার বিষয় শুনিয়া তাঁহার শয়ন কক্ষে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন তখন তাহার কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই দেখিয়া পুনরায় আর একটী খাইতে দিলাম। এবার তিনি সেই মূলটী চর্ব্বণ করিয়া নিজেই খাইলেন। তাহাতে তাহার অপরিসীম তৃপ্তি লাভ হইল এবং শ্বাসের যন্ত্রণাও একেবারে তিরোহিত হইল। শরীর ক্রমশঃ বলবান হইতে লাগিল। অজস্র অর্থ নষ্ট করিয়া যাহা হয় নাই—শ্রীগুরুর শ্রীচরণ কৃপায় দুইটী মূলের দ্বারা যেরূপ ফল হইল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি নিজেই বলিলেন—"ভগবান আমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এইবার আমার রোগ সম্পুর্ণরূপে আরোগ্য হইল।" বৃদ্ধ আর আমাকে ছাড়িতে চাহেন না, প্রায় দুই মাস কাল তাঁহার ভবনে অতিবাহিত করিলাম। তিনি পূর্ব্বে আমার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি বাল্য হইতে মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়াছিলাম।

তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"বাপু এক পক্ষে তুমি আমার জীবনদাতা; বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তুমি আমার নিকট দেবতা স্বরূপ। আমি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তোমার করে আমার একমাত্র ললামভূতা কন্যা হেমলতাকে সমর্পণ করিতে বাসনা

করি। আমার কন্যাকে বিবাহ করিলে তুমি আমার এই অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে; আমার আর পুত্রাদি কিছুই নাই। পত্নীও বহুপূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তুমি আমাদের স্বঘর, অতএব বিবাহে কোন বাধা হইবে না, পরন্তু শ্রীবৃন্দাবনবাসী সেই মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করা হইবে। আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না; এক-জন লোক পাঠাইয়া গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ করিতে বলিলাম। তাঁহার অনুমতি প্রাপ্তির পর শুভদিনে শুভক্ষণে জমীদার কন্যা হেমলতার সহিত আমার পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এখন হইতে আমি মনোহরপুর জমীদারীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলাম। আমার উপর সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া জমীদার মহাশয় ইষ্ট-আরাধনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন, বলা বাহুল্য যে সেই ঔষধ সেবনেই তাঁহার দুরারোগ্য শ্বাসরোগ আরোগ্য হইয়াছিল। কিছুদিন পরে একদিন নায়েবের মুখে শুনিলাম যে গোবিন্দপুরে হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের জমীদারী লাটে চড়িয়াছে; তখন মনে করিলাম—দাদা হয়ত, দেনার দায়ে, না হয় বৌদিদির পরামর্শে ইহা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে-ছেন। তখন নায়েবকে উহা ক্রয় করিতে বলিলাম। পৈতৃক সম্পত্তি পরের হইবে, ইহা কিছুতেই দেখিতে পারিব না। সম্পত্তি খরিদ করা হইল। ইহার তিন চারি বৎসর পরে গৃহিণী রোগে আমার শ্বশুর মহাশয় লোকান্তরিত হইলে—আমার স্ত্রীর ইচ্ছা ক্রমে গোবিন্দপুরে অবস্থানের মনস্থ করিলাম এবং তজ্জন্য পুনরায় আপনার শ্রীচরণ দর্শন লাভ হইল। কিন্তু জেঠা মহাশয়!

আমার এ সমস্ত যে বৃথা হইল। আদর্শ-চরিত্র, ধার্ম্মিক-প্রবর দাদার আমার এ দুর্গতি কেন হইল।" এই বলিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। রমানাথ বাবু নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া সতীকান্তের চিত্ত সুস্থির করিলেন। রমানাথ বাবু বলিলেন— সতি! দেবালয় ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার গুরুদেবকে আনিলে ভাল হইত, তাঁহার ন্যায় সাধকের দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া উচিত।"

সতী। আজ্ঞে হাঁ; তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছি। রাত্রি অধিক হইয়াছে। পরদিন গৃহপ্রবেশ ও ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে, আর রাত্রি জাগরণ উচিত নহে। রমানাথ বাবু বলিলেন "বাবা! রাত্রি অধিক হইয়াছে অদ্য গৃহে যাও, কল্য প্রাতঃ-কালেই আমি যাইব।" এই বলিয়া সতীকান্তের ধর্ম্মকাহিনীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় শয়ন করিতে গেলেন। সতীকান্তও আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন।

(৯)

পরদিন প্রত্যুষে সতীকান্তের আগমন সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। মনোহরপুরের জমীদার যে আর কেহ নহে— হরেন্দ্রনারায়ণের ধার্ম্মিক পুত্র সতীকান্ত, তাহা আবাল-বৃদ্ধ-বণি-তার জানিতে বাকী রহিল না। সকলেই মনের আনন্দে আসিয়া যাহাতে শুভকার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, তাহার জন্য প্রাণ-পণ করিতে লাগিল। পাড়ার স্ত্রীলোকগণ আসিয়া সতীকান্তের অন্দর আলোকিত করিয়াছেন এবং হেমলতার অমায়িক প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেছেন। সতীকান্তের বাল্য-বন্ধুসকল

আজ জীবন উৎসর্গ করিয়া খাটিতেছে—কাহাকেও কোন কার্য্য বলিয়া দিতে হইতেছে না, সকলেই আপনার কার্য্য ভাবিয়া সকলের মনস্তুষ্টি করিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহাতে কার্য্যে সুযশ লাভ হয়, সে বিষয়ের তত্ত্বাবধারন করিতেছেন। পাঁচ সাতখানি গ্রামের ব্রাহ্মণ ও শুদ্রের ভোজন ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। কাঙ্গালী বিদায় হইতে রাত্রি প্রহর অতীত হইল। কার্য্য এরূপ সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হইয়াছিল যে একটী প্রাণীও নৈরাশ হয় নাই বা কাহার মুখে ধন্য ধন্য সুখ্যাতি বই অখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ধার্ম্মিকের কার্য্য এইরূপ ভাবেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহার হৃদয়ে আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, এই সকল সৎকার্য্যে তাহার সুযশ লাভ করা অতীব দুরুহ ব্যাপার। মাটী না হইলে এ মাটীতে কাহার কবে যশোলাভ হইয়াছে? অদ্যকার কার্য্য শেষ হইল। কেবল অতিথিশালা ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা বাকি রহিল। অদ্য রজনীযোগে সতীকান্তের গুরুদেব আসিলেই কল্য ঐ সকল কার্য্যের শুভ অনুষ্ঠান হইবে। সতীকান্ত গুরুদেবের প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি স্ত্রীপুরুষে জাগরণ করিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে রজনী শেষ সীমা অতিক্রম করিল। চিত্তহারিণী ঊষা সতী শ্বেত-বসনাবৃতা হইয়া ধরামাঝে আসিয়া উদয় হইলেন। সতীকান্ত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পবিত্র চিত্তে ভগবানের গুণগান করিয়া প্রাতঃকাল অতিবাহিত করিলেন। বেলা প্রহর অতীত হইল। এবার শ্রীবৃন্দাবনবাসী পরম জ্ঞানী নিত্যানন্দ গোস্বামী তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিলেন।

সতীকান্ত সস্ত্রীক তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র আসনে সমাসীন হইলেন। সঙ্গে একটী দীর্ঘ জটাশ্মশ্রু-ধারী শিষ্য আসিয়াছিলেন। তিনিও পৃথক আসনে উপবেশন করিলেন। সতীকান্ত পূর্ব্ব হইতে শিষ্যটীকে দেখিয়া যেন কিরূপ বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুহুর্মুহুঃ তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভাস্বর দৃষ্টি দেখিলে বোধ হয় সতী-কান্ত যেন কোনও অদ্ভুত বস্তুর দর্শন পাইয়াছেন। প্রতিবাসী সকলে এই মহাপুরুষের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়া একে একে গৃহে গমন করিল। প্রভু নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস! এই কয় বৎসর শারীরিক বেশ কুশলে আছত, কল্যা-কার" সৎকার্য্য বেশ সুসম্পন্ন হইয়াছে ত?

সতীকান্ত গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া পুনরায় করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দৃষ্টি কিন্তু তাঁহার সেই শিষ্যের প্রতি নিপতিত রহিয়াছে। এই সময় শিষ্যটী একটু স্থানান্তর হইলে নিত্যানন্দ বলিলেন—"সতি! আর কেন, পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর, যে তোমার সুখে সুখী, তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, তাঁহার বাক্য অবহেলা করিয়া গৃহ-ত্যাগ করিয়াছিলে—এখন কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ?"

এইবার সতীকান্তের সমস্ত সন্দেহ দূর হইল—তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দাদা! দাদা!! আদর্শ ধার্ম্মিক, ভ্রাতৃভক্ত—আমার জন্যই তোমার এই দশা, আমায় ক্ষমা কর। তোমার অপার স্নেহের গুণে আজ আমার এই সৌভাগ্য উদয়

হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর ভাই!" এই বলিয়া বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দের সহিত সমাগত শিষ্যটীও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—সতি! প্রাণের সতীকান্ত; আজ গুরুদেবের কৃপায় তোমার এইরূপ সৌভাগ্যোদয় দেখিয়া আমার সমস্ত অভিমান দূর হইয়াছে; উঠ ভাই! দোষী তুমি নহ, দোষী আমি" এই বলিয়া নলিনীকান্ত ভ্রাতার হস্তধারণ করিয়া ভূমি হইতে উত্তোলন করিলেন,—এবং বহুদিনের পর তাহাকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করতঃ তাপিত হৃদয় শীতল করিলেন। আজ পরম জ্ঞানী মহাত্মা নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাতে দুইটী সংসার-চক্র বিঘূর্ণিত ধর্মাত্মার পুনর্মিলন হইল, আনন্দের দিনে প্রবল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। মৃত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পবিত্র বাস্তু আবার পবিত্রতার আগার হইয়া উঠিল। নলিনী গৃহে আসিয়াছে শুনিয়া পাড়ার সকলে ছুটিয়া আসিল। শুভ দিনে এই শুভ সম্মিলনে অন্দর মহল হইতে হেমলতা কর্ত্তৃক মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইল। ধর্ম্মের বিজয়-ডঙ্কা আবার বাজিয়া উঠিল।

গুরুদেবের মুখে নলিনীকান্তের অদ্ভুত ভ্রাতৃপ্রেম, দীনহীনবেশে শ্রীবৃন্দাবন ধামে তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার শ্রীমুখে ভ্রাতার উন্নতি কাহিনী ও আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিয়া নলিনীকান্তের জীবন-ত্যাগ-সংকল্প পরিত্যাগ প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া সতীকান্ত অশ্রুজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। হেমলতা ইতিপূর্ব্বে কখন কুলপ্রদীপ সেই দেবোপম মূর্ত্তি দর্শন করেন নাই;

কেবল সতীকান্তের মুখে তাঁহার অদ্ভুত গুণগরিমার কথা শুনিয়াছিলেন। তিনিও আজ তাঁহার অমানুষিক ত্যাগস্বীকার দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাই দেবতার আবির্ভাব জানিয়া ঘন ঘন শঙ্খধ্বনী করিয়াছিলেন। ইহা যে তাহার মহদ্বংশের জন্মগ্রহণের পরিচয় তাহাতে আর সন্দেহ কি!

পরদিন শ্রীগুরু কর্ত্তৃক নলিনীকান্তের নামে দেবালয় ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। অতিথি সংগ্রহের জন্য চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। পুত্রবধূ কর্ত্তৃক এতদিন ৺হরেন্দ্রনারায়ণ নরকস্থ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আজ পুত্রদ্বয় কর্ত্তৃক পবিত্র ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার আত্মার পরম গতিলাভ হইল। এইরূপ পুত্র হইলেই বংশের অধঃস্তন ও উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

উপসংহার।

পরদিন নিত্যানন্দ প্রভু শিষ্যদ্বয়কে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নলিনীকান্ত আর বিবাহ করিলেন না। ভ্রাতাও পতিব্রতা ভ্রাতৃবধুর সংসারে শ্রীগুরুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রামেরমা ও প্রভুভক্ত রামদাস পুনরায় আসিয়া জুটিল। রামদাসের প্রতি অতিথিশালার ভার ন্যস্ত হইল। রামদাস ধর্ম্মভাবে তাহাই পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। অতিথিশালায় এখন অতিথির সংখ্যাও শতাধিক হইবে। ইহাদের নিত্য ভরণপোষণের ভার বহন করিতে নলিনীকান্ত কুণ্ঠিত নহেন। এখন দুইটী বৃহৎ জমীদারীর আয় তাঁহার করায়ত্ত। হেমলতা ও সতীকান্ত নলিনীকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সুখের সংসারে আবার সুখের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। একদিন রামদাস আসিয়া নলিনীকান্তকে বলিল—"বাবু! অতিথিশালায় একটী স্ত্রীলোক আসিয়াছে; সর্ব্বাঙ্গে তাহার ক্ষত রহিয়াছে; দুর্গন্ধে থাকা দায় হইয়াছে; পাছে অন্যান্য কাহার পীড়া হয় এই জন্য আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি; এক্ষণে আপনার কিরূপ অনুমতি হয়।"

নলিনী ও সতীকান্ত এই সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং একটী আলাহিদা গৃহে তাহাকে রক্ষা করিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কিছু হইল না;

রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, উৎকট গন্ধে গৃহে থাকা দায় হইল। কিন্তু নলিনীও সতীকান্ত সমভাবে বসিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় তাহার বদনে দুগ্ধ ও গঙ্গাজল প্রদান করিতে লাগিলেন। ভিখারিণীর অন্তিমকাল উপস্থিত, তথাপি সে সেই মলিন বসনে বদন আবৃত করিয়া কেবল কাঁদিতেছে, একদিন নলিনীকান্ত কাছে নাই। সতী অহোরাত্র জাগরণ করিয়া আছেন। ধূনা, গুগ্‌গুল প্রভৃতি সৌগন্ধে গৃহ আমোদিত, তথাপি সময়ে সময়ে ক্ষতস্থানের দুর্গন্ধে নাসিকা উত্তেজিত করিতেছে; সতীকান্ত তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বসিয়া আছেন। ভিখারিণী এতদিন আত্ম-প্রকাশ করে নাই, কেবল বদনে বসন আবৃত করিয়াছিল। অদ্য কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। যে সতীকান্তের প্রতি সে একদিন কুক্কুর অপেক্ষাও ঘৃণিত ব্যবহার করিয়াছে, আজ তাহার দেব চরিত্র ও অমানুষিক ব্যবহার দেখিয়া আর হৃদয় বেগ দমন করিতে পারিল না উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল—"সতীকান্ত! প্রাণের দেবর! পাপিণীর পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমার এ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার অবসান হইবে না মৃত্যু সুনিশ্চয়। এক্ষণে তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না করিলে—আমার মৃত্যু হইবে না, আর তোমার দাদাকে একবার ডাকিয়া দাও; যদিও সে দেবতার দর্শনে আমার অধিকার নাই; তথাপি যখন তোমাকে পাইয়াছি; যখন তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারিয়াছি, তখন তাহারও পাইব। ওঃ কি যন্ত্রণা, সুখের আশায় কি করিতে গিয়া কি করিয়াছি; অমৃত ভ্রমে হলাহল পান করিয়া এখন

প্রাণ যায়। সতি! দেবর! আর কাল বিলম্ব করিও না—প্রায়শ্চিত্তের সময় একবার পরকালের প্রতি চাহিয়া সদয় ব্যবহার কর।" সতীকান্তের বুঝিতে আর বাকি রহিল না—পাপিনী বিমলার যে পরিনামে এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন এবং ত্বরিত গতিতে নলিনীকে সংবাদ দিলেন। নলিনী বিমলার কথা শুনিয়া প্রথমতঃ আসিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে সরল হৃদয় সতীকান্তের নির্ব্বন্ধ্যাতিশয়ে আসিতে বাধ্য হইলেন। নলিনীকে সন্মুখে দেখিয়া বিমলা বলিল—"পাপিনি! আর আপনাকে সে পবিত্র সম্বোধনের অধিকারিণী নহে। আমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; এক্ষণে উভয়ে একবার বলুন—আমার যাবতীয় অপরাধ আপনারা ক্ষমা করিবেন। তাহা হইলে আমার এখনি মৃত্যু হইবে—আমার সকল যন্ত্রণার লাঘব হইবে। নতুবা এ প্রাণ কিছুতেই পাপদেহ পরিত্যাগ করিবে না।" বিমলার যন্ত্রণা দেখিয়া সতীকান্ত বাস্তবিক কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—বৌদিদি! পুত্রের মঙ্গলের জন্যই পিতামাতা তিরস্কার করে। মাতৃ-স্থানীয়া তুমি যাহা করিয়াছিলে—তাহাতে আমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় নাই। অতএব সে সকল কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি; ভগবান তোমাকে শান্তি প্রদান করুন। তুমি সহস্রগুণে পতিতা হইলেও, আমার ক্ষমা করিবার অধিকার নাই।" নলিনী ঘৃণায় আর বেশী কথা কহিলেন না—কেবল বলিলেন—"আমার সংসারে তুমি যে সকল কুকর্ম্ম করিয়াছিলে তজ্জন্য তোমায় ক্ষমা করিলাম।" নলিনীকান্তের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে "আঃ—জ্বালা কতক নির্ব্বাণ হইল। নরলোকে

পাপিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া সাবধান হউক।" এই বলিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া পাপিনীর পাপ-প্রাণ দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। পাপিনী বিমলার পরিণামে ইহাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।
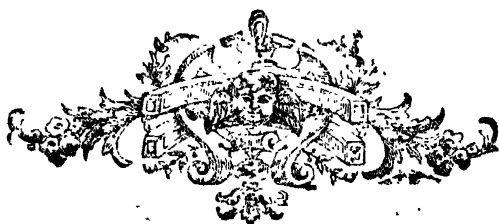
প্রতিহিংসা ।

প্রতিহিংসা।

১

সামান্য সরোবর-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত যে একদিনের জন্যও সহ্য করে নাই, তাহার পক্ষে মহাসমুদ্রের তরঙ্গ যেরূপ অসহ্য; একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক সংসারানভিজ্ঞ যুবকের পক্ষে একেবারে সংসারের সকল ভার নিজস্কন্ধে বহন করা তেমতি অসহ্য। পিতৃবিয়োগের পর নরেশচন্দ্রের প্রথম সংসার প্রবেশ সেইরূপ অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আজ মাসাবধি হইল—রাধানাথ ভট্টাচার্য্য ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন ইহারই মধ্যে তদীয় পুত্র নরেশচন্দ্রের এত কষ্ট; আরও কিছুদিন গত হইলে না জানি আরও কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। কমলপুরে রাধানাথ ভট্টাচার্য্যের বহুদিনের বাস, সংসারের অবস্থা তাঁহার তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না। তবে তাহার কতকগুলি শিষ্য ছিল বলিয়া বহুকষ্টে এক প্রকার সংসার চলিয়া যাইত কোনও প্রকার অনাটন হইত না। তাঁহার পুত্র নরেশচন্দ্র ইংরাজী পড়িয়াছেন, আজীবন কেবল কলিকাতায় থাকিয়া কলেজের পাঠ অভ্যাস করিয়াছেন, এ সকল বিষয় তাঁহার আদৌ অভ্যস্থ নাই বা এরূপ করিয়া সংসার পরিচালন করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। নরেশচন্দ্র যদিও এফ্, এ, পাশ করিয়াছেন কিন্তু অন্য,ন্য বালকের মত তাঁহার মাস্তস্ক বিকৃত হয় নাই, স্বধর্ম্মে

বিদ্বেষ, দেবদ্বিজে অভক্তি প্রভৃতি অনাচার তাঁহার চরিত্রকে কলুষিত করিতে পারে নাই, তিনি এক প্রকার স্বাধীনচেতা ছিলেন, কাহার দাসত্ব করিয়া সংসার চালাইব এরূপ প্রবৃত্তি তাঁহার মনে উদয় হইত না। বিবাহ করিয়া সংসারী হইতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাহা হইলে রাধানাথের জীবিতাবস্থায় তাঁহার বিবাহ কার্য্য সমাধা হইত কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই বলিয়া এখনও তিনি অবিবাহিত আছেন। তাঁহাকে অক্ষম ও ইংরাজী নবীশ দেখিয়া শিষ্যবর্গ প্রথম প্রথম তাঁহাকে কাজ-কর্ম্মে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন, পূজাদিতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেন কিন্তু নরেশচন্দ্র তাঁহার কিছুই জানিতেন না, আর লোক রাখিয়া কাজ করাইলে দুই জনের সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া তিনি শিষ্যদের আশা ভরসা ত্যাগ করিলেন। শিষ্যরাও সময়ে তাঁহাকে না পাইয়া অপর পন্থা অবলম্বন করিল। এখন নরেশচন্দ্রের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে কেবল কয়েক বিঘা ধান জমি ও একখানি ক্ষুদ্র বাগান—ইহাই তাঁহার উপজীবিকা, সংসারের সম্বল—জীবনের আশা ও ভরসার স্থল। নরেশচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া কোনও রূপ অহঙ্কার করিতেন না। আলস্যে কাল কাটান তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ; তিনি উদ্যোগী ও পরিশ্রমী। দিনরাত পরিশ্রম করিয়া এই পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে এক প্রকার সুখে ও স্বাধীনভাবে সংসার চালাইতে লাগিলেন। তথাপি কাহার অধীন হইয়া দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেন না। সংসারে তাঁহার বৃদ্ধা জননী ও একটী অপ্রাপ্ত-বয়স্কা ভগিনী, নাম—সুমতি। পিতৃবিয়োগের পর নরেশ কলি-

কাতা ত্যাগ করিয়া পল্লীজীবনের নির্ম্মল সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

২

নরেশচন্দ্র পাড়ায় বড় একটা কাহার সহিত বেশী মেশামিশি করিতেন না। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ নিষ্কর্ম্মা লোক অহঃরহঃ কেবল পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় দিন কাটায়; নরেশ সে সকলের ধার দিয়াও যাইতেন না। তিনি দূরতর গ্রামে একটী ধনীর পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—এই কার্য্য করিয়া যেটুকু সময় পাইতেন, বাগানের কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। সামান্য দিনের মধ্যে নিজ চেষ্টায় বাগানের উৎপন্ন আয়ে সংসারের বাজে খরচগুলি চালাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কয়েক বিঘা জমীতে উৎপাদিত ফসলে তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত; শিক্ষকতা করিয়া যাহা পাইতেন—তাহা অবিবাহিতা ভগ্নীটীর বিবাহের জন্য সঞ্চয় করিতেন। এইরূপে ভবিষ্যৎ শিক্ষা বিষয়ে উন্নতির আশা তাঁহার সমূলে বিনষ্ট হইল। মানুষ যাহা মনে করে সব সময়ে ভগবান তাহা সম্পন্ন করিতে দেন না। নরেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা জল বুদবুদের ন্যায় মনে উৎপত্তি হইয়া মনেই লয় পাইতে লাগিল। স্বামীর মৃত্যুর পর নরেশের মাতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, নানাবিধ রোগ তাঁহার দেহবৃক্ষ আশ্রয় করিল। আজ জ্বর, কাল পেটের পীড়া, পরশু মাথার যন্ত্রণা, বৃদ্ধা অনবরত রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। নরেশচন্দ্র মহাবিপদে পড়িলেন; ছোট ভগ্নীকে লইয়া জননীর শুশ্রূষা ও সংসার চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু

এরূপ করিয়া আর কতদিন চলিবে? অর্থাদির চেষ্টা না করিলে ত আর সংসার চলিবে না। কনিষ্ঠা ভগিনীর তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধা ও রুগ্না জননীকে রাখিয়া কোথাও যাইতে বা কাজকর্ম্ম করিতে তাঁহার ভরসা হয় না। দিন দিন জননীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইতেছে—তাহাতে তাঁহাকে আর কোনও কাজ কর্ম্ম করিতে দেওয়া যাইতে পারে না—তাঁহার শারীরিক অবস্থাও এখন আর তাদৃশ ভাল হইবে না যে পূর্ব্বের ন্যায় তিনি সংসার মাথায় করিয়া থাকিবেন। কাজেই বৃদ্ধা পুত্রকে বিবাহের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পুত্র হইয়া জননীর শেষ অনুরোধ রক্ষা না করিলে পাছে পতিত হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। আর বিবাহ না করিলেই বা সংসার চলিবে কেমন করিয়া? নানা প্রকার চিন্তার পর তিনি পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু কমলপুরে তাদৃশ বয়স্থা পাত্রী পাওয়া গেল না। তাঁহার মাতুল রত্নেশ্বর বাবু কোনও দূরদেশে কর্ম্ম করিতেন, নরেশ সাংসারিক দুরবস্থার বিষয় তাঁহাকে জানাইলে তিনি বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না, বীরভুম জেলায় তিনি একটী বয়স্থা পাত্রীর সন্ধান করিয়া নরেশকে পত্র লিখিলেন। নরেশ পত্র পাইয়া জননীকে তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। জননী তাহাতে স্বীকৃতা হইয়া আগামী শুভদিনেই কার্য্য শেষ করিতে বলিলেন। নরেশ জননীর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তথায় যাত্রা করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে একটী বয়স্থা বরাঙ্গনার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহে আনিলেন। নরেশের নবোঢ়া পত্নীর নাম—কমলা;

বয়সে বিবাহ হওয়ায় তাঁহার যাবতীয় অঙ্গের পরিপুষ্টি সাধনা হইয়াছিল। এক্ষণে কমলা যুবতী, রূপে গুণে কমলা—সাক্ষাৎ কমলা—লক্ষ্মী ; দরিদ্রের পর্ণকুটিরে সমুজ্জ্বল মাণিক্য;বিবাহের পর হইতে নরেশের অনেক ভারের লাঘব হইল—কমলাই তাহা গ্রহণ করিলেন। আর সুমতি বৌদিদির সংসার কার্য্য সহায়তা করিয়া হাসি খেলায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা রোগগ্রস্তা জননী নববধূর সেবা শুশ্রুষায় ক্রমশঃ রোগমুক্ত হইতে লাগিলেন।

কমলাকে বিবাহ করিয়া নরেশচন্দ্র একটু বিপদে পড়িলেন। গ্রামের অনেক লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—কমলার পিতৃ-পুরুষগণ এদেশীয় ব্রাহ্মণ নহেন। উড়িষ্যা হইতে আসিয়া তাঁহারা বীরভূমে বাস করিয়া ছিলেন। কিন্তু সে কথা কাণা ঘুসাতেই কাটিয়া গেল ; তাহা লইয়া এ যাত্রা বড় একটা গোলমাল হইল না। নরেশ প্রথম প্রথম সামাজিক নিমন্ত্রণাদিতে যাইতে ভয় করিতেন—কি জানি পাছে সভার মধ্যে কেহ কিছু বলে কিম্বা তাঁহার বিবাহ সংক্রান্ত কথা লইয়া কোনরূপ অপমান করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে সকল কথা ঢাকা পড়িয়া গেল—আর বড় কোনও গোলমাল হইল না। তখন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ খাওয়া চলিতে লাগিল। নরেশচন্দ্রের সংসারে তাঁহার বৃদ্ধা জননী, নব-বিবাহিতা পত্নী ও অবিবাহিতা ভগ্নী সুমতি। একে তাদৃশ অর্থবল নাই ; তাহার উপর আবার কিছুদিন হইল তাঁহার বিবাহ লইয়া গ্রামে একটা গোলযোগ হইয়াছিল, এইরূপ [illegible] ভগ্নীর বিবাহে বড় কেহ অগ্রসর হইল না।

নরেশচন্দ্র শিক্ষকতা করিয়া যৎসামান্য যাহা উপার্জ্জন করি-তেন; কমলার গৃহিণীপনায় তাহাতেই সংসার বেশ সুখে সচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। বৃদ্ধা জননী গৃহের কর্ত্রী, আর কমলা তাঁহার দাসীরূপে ও সুমতি কমলার সহচরী স্থলাভিষিক্তা হইয়া নরেশের সংসার সমুজ্জল করিতে লাগিলেন। শশ্রূদেবী রন্ধনের জন্য প্রত্যহ যে তণ্ডুল প্রদান করিতেন—কমলা তাহা হইতেও এক-মুষ্টি করিয়া সরাইয়া রাখিতেন। নিজে অল্প পরিমাণে আহার করিয়া প্রতিদিন এইরূপে সঞ্চয় করিতেন। অল্প উপার্জ্জন করিয়া সতীলক্ষ্মী গৃহিণীর গুণে নরেশচন্দ্র একদিনের জন্যও সংসার লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন নাই। এইরূপে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। নরেশের জননীর রোগ এত চিৎকিসায়ও বাগ মানিল না। নরেশ চিকিৎসক পরিবর্ত্তন করিয়া তদপেক্ষা আর একজন বিজ্ঞ চিকিৎ-সক আনিলেন। কিন্তু বৃথা—সমুদ্রে তৃণরাশির ন্যায় সমস্ত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কমলা প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অবধি সংসারে প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেন, একদিনের জন্য তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন না। সর্ব্বপ্রথমে তিনি রোগীর আহারাদি প্রস্তুত করিয়া পরে স্বামী ও ছোট ননদিনীকে খাওয়াইতেন। আপনার আহারের জন্য তাঁহার তত আড়ম্বর ছিল না। এক একদিন এমন হইয়াছে যে, তিনি এক পয়সার মুড়ি খাইয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শরীরের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই বরং দিন দিন দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হৃদয়ের ধর্ম্মভাব ও তৎকর্ত্তৃক মনের স্ফূর্ত্তি যে দেহের লাবণ্য বৃদ্ধির একমাত্র উপায়।

পতিপরায়ণা, ধর্ম্মশীলা কমলার ধর্ম্মভাবে দেহ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। শাশুড়িকে ভালরূপে চিকিৎসা করাইতে হইবে, ইহাতে তাঁহাদের যত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিবেন। কমলা বাল্যকালেই মাতৃহীনা, মাতৃস্নেহ কিরূপ তিনি একদিনের জন্য জীবনে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এখানে আসিয়া তিনি সে স্নেহের কথঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়াছিলেন; জননী ও শশ্রুদেবীর মধ্যে যে কোনও প্রভেদ নাই: তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য প্রাণের আকাঙ্খা মিটাইয়া পতি ও পত্নীতে জননীর পুনর্জীবনের আশা করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় কি হইবে—মৃত্যু রোগের কি ঔষধ আছে? একদিন হঠাৎ অজস্র রক্তস্রাব হইয়া বৃদ্ধা সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অন্তধামে গমন করিলেন। এত যত্ন, এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয় সমস্তই বৃথা হইল। শশ্রু বিয়োগ-শেল কমলার হৃদয়ে বিষম বাজিল, কিন্তু কি করিবেন—, ইহা যে মনুষ্য শক্তির অতীত, কোন উপায় ত নাই? নরেশচন্দ্র বহুকষ্টে মাতৃদায় হইতে মুক্তিলাভ করিলেন বটে কিন্তু একটী মহৎ দায় সমাধা করিতে যে এখন তাঁহার বাকি রহিয়াছে—সে দায় হইতে উদ্ধারের উপায় না করিতে পারিলে ত তাঁহার নিস্তার নাই! সুমতি যে ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে। অশৌচান্তে এবিষয়ের উদ্ধার সাধনা না করিলে আর চলিবে না।

এবার গ্রামে বড়ই কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ওলাদেবীর কোপদৃষ্টিতে গ্রামের কত স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবা যে অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে—তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য।

রামধন শিরোমণি এই গ্রামের মণ্ডল। গ্রামবাসীকে সকল বিষয়ে তাঁহার মতামত লইয়া কাজ করিতে হয়। গ্রামে পৌরহিত্য করাই তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা, এই জন্ত সকলে তাঁহাকে বড় মান্ত করিত এবং কাজ কর্ম্মে প্রাপ্য মর্য্যাদা দানে বৃদ্ধের মনস্তুষ্টি করিত। গ্রামে যখন মড়ক উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। এই বার শ্রাদ্ধাদিতে তাঁহার অনেক প্রাপ্য হইবে। এইবার তিনি গুণময়ী গৃহিণীকে স্বর্ণ অলঙ্কারে সজ্জিতা করিয়া, তাঁহার গুরু গঞ্জনার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন। বৃদ্ধের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, এ অবস্থায় পত্নী তাঁহার পক্ষে কিরূপ উপাদেয় সামগ্রী তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। বিবাহ করিয়া তিনি যাহা কিছু অলঙ্কার পাইয়াছিলেন এতদিন বসিয়া খাইয়া তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। এখন গ্রামে তেমন আর কাজ কর্ম্ম নাই। যম-কিঙ্করের গতায়াত এ গ্রাম হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে, বলিলেই হয় কাজেই বৃদ্ধের পাওনা গণ্ডারও অভাব হইয়াছে। তাহার উপর অলঙ্কার বন্ধক দিয়া সংসার চালাইতে হইতেছে। ইহাতে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী স্বামীর প্রতি কিরূপ অনুরক্তা তাহা সহজেই অনুমেয়। বৃদ্ধ বয়সে যুবতী ভার্য্যার নিকট স্বামী মহাশয় যেন কৃতদাস; পত্নী তাঁহাকে যখন যেরূপ ভাবে চালিত করিবেন সেইরূপ ভাবেই চলিতে হইবে, নতুবা তাঁহার নিস্তার নাই। পত্নী তাদৃশ অনুরক্তা না হইলেও পতি তাহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়েন, বৃদ্ধ বয়সে বিবাহবন্ধনের ইহাই নিয়ম, "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণে

তোপি গরীয়সী" একথার সার্থকতা এসময় পদে পদেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রণয় বন্ধনে পত্নী যত বাঁধা পড়ুন আর নাই পড়ুন, পতি বিধিমতে বন্ধনজ্বালার যন্ত্রণা অনুভব করেন। কিন্তু এবৎসর তাঁহার আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই; ভার্য্যাকে প্রত্যহই আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—ওরে পাগলি এবৎসর তোকে সোণায় মুড়িয়া ফেলিব, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। শিরোমণি মহাশয় জানিতেন—তাহারই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যমরাজ এবার এ অঞ্চলে শুভদৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সংক্রামক রোগ যে কখন কাহাকে লইয়া শমন ভবনে গমন করিবে—তাহা কে বলিতে পারে? একদিন রজনী যোগে শিরোমণি মহাশয়ের হঠাৎ ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল। একবার ভেদ ও একবার বমি হইয়াই রামধনের প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ তরুণী ভার্য্যাটী অকালে শমন সদনের আতিথ্য গ্রহণ করিল। শিরোমণি মহাশয় যাহা মনের কোণেও একদিনের জন্য স্থানদান করেন নাই; যমকিঙ্কর চোর-বেশে আশেপাশে ঘুরিয়া শেষে তাঁহার গৃহপ্রবেশ করিয়া অমূল্য রত্নটীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধের শেষ জীবনের আশা-প্রদীপ এইখানেই নির্ব্বাণ হইল।

(৫)

কিছু দিন পরে গ্রামে আবার সুবাতস বহিয়াছে। গ্রামখানি শান্তিময় হইয়াছে। বুঝি শিরোমণিকে শেষদশায় শোকানলে দগ্ধ করিবার জন্যই দুর্দ্দান্ত কলেরা গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহার প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী পত্নীটীকে কবলিত করিবার জন্যই বুঝি যমরাজ এ দেশে বহু দিনের পর আবির্ভাব হইয়াছিলেন

ভার্য্যাটীও মরিল, ওলাদেবীও প্রস্থান করিলেন, গ্রামখানিও পূর্ব্বের ন্যায় শান্তিভাবে পরিপূর্ণ হইল। সকলেই আবার পূর্ব্বের ন্যায় মনের আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল, কিন্তু রামধনের অন্তরে যে শূন্য ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, কই তাহা ত আর পূর্ণ হইল না? শিরোমণি মহাশয় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। সুমতি একপ্রকার অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে। নরেশচন্দ্র ভগ্নিটীর বিবাহ লইয়া বড়ই গোলযোগে পড়িয়াছেন। একে সেরূপ অর্থবল নাই, তাহাতে তাঁহার বিবাহ লইয়া পূর্ব্বে একটা কথা উঠিয়াছিল বলিয়া সহজে কেহ তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করিতে চায় না। কমলা অবশ্য এ সকল কথার কিছু কিছু আভাস পাইয়া বুঝিয়া লইলেন, যে নরেশচন্দ্র তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া সুমতির বিবাহে এত বিড়ম্বনা ঘটিতেছে। নরেশচন্দ্র কিন্তু ইহার বিন্দু বিসর্গও পত্নীর নিকট উত্থাপন করেন না, পাছে সতীসাধ্বীর মনে কোন কষ্ট হয়। বুদ্ধিমতী কমলা কিন্তু আভাসে তাহা বুঝিয়া বড় কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

আজ শ্রাবণ মাসের অর্দ্ধেক দিন গত হইয়াছে; এখন বিবাহের কোনও উপায় হইল না। এ বৎসরও বুঝি কাটিয়া যায়, শ্রাবণ মাস অতীত হইলেই আর এবৎসর বিবাহ হইবে না। অকাল পড়িল বিবাহের দিন আর পাওয়া যাইবে না। একদিন দারুণ বর্ষার অন্ধকারময় অপরাহ্নে পতি পত্নীতে বসিয়া এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। সুমতি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত

আছে। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—"নরেশ ঘরে আছ হে ?" নরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—বৃদ্ধ শিরোমণি মহাশয় তাহার দ্বারে উপস্থিত। তিনি মনে করিলেন—শিরোমণি মহাশয় হয়ত কোনও পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার বাটী উপস্থিত হইয়াছেন। নরেশচন্দ্র শশব্যস্তে বহির্বাটীর দরজা খুলিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন এবং এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিলেন। পরে নিকটে উপবেশন করিয়া স্বাগত প্রশ্নাদির পর, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিরোমণি মহাশয় হুকায় কদলী পত্রের নল লাগাইয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—"আর কি ভায়া ! তোমারই সৌভাগ্য, গৃহিণী মরিয়া প্রাণে বড়ই দাগা দিয়াছেন, বুঝেছ তো।"

নরেশ—"দাদা মহাশয় ! সে কথা সত্য, বৃদ্ধ বয়সে পত্নী বিয়োগ বড়ই কষ্টকর, কিন্তু কি করিবেন—তাহাতে ত মানুষের হাত নাই।

রামধন—"তাত ঠিক কথা ভায়া ! তবে কি জান, গৃহস্থের অবিবাহিত থাকিতে নাই ; শাস্ত্রের বিধান ! তা তোমারই সৌভাগ্য ;—আপনা আপনির মধ্যে—তা আর ঘটক পাঠাইব কি ? নিজেই বলিতেছি—তোমার ভগ্নীকে আমার সহিত বিবাহ দাও। গরীব তুমি, বুঝেছ, এতে তোমারই সৌভাগ্য। বিষম ভাবনা থেকে নিস্তার পাও।" সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ দন্ত নাড়িতে নাড়িতে নরেশের নিকট প্রস্তাব করিল। নরেশচন্দ্র বিস্ময় সরোষে কাঁপিয়া উঠিল। বৃদ্ধের পণ্ডিত দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার কেমন মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠিল। উচিৎবক্তা নরেশচন্দ্র বলিয়া

ফেলিলেন—"মহাশয়! আপনি ক্ষেপেছেন নাকি? ওকথা বলিতে আপনার একটু সঙ্কোচ বোধ হইল না! আপনার তিন কাল গিয়েছে—এখন আবার বিবাহ! আমার ভগিনীকে বিবাহ করিবেন, সে কথা আবার বলিতে আসিয়াছেন? তার চেয়ে সুমতিকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলিয়া দিব—সেও ভাল, তথাপি আপনার সহিত বিবাহ দিতে পারিব না।"

নরেশের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন—"বটে; এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি রামধন শিরোমণি, আমায় অবজ্ঞা! তবু উড়ের মেয়ে বিয়ে করেছ, আচ্ছা থাক।"

আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া রামধন চলিয়া গেলেন। কমলা গেহের ভিতর হইতে সমস্ত শুনিলেন।

৬

এই ঘটনার তিন চারদিন পরে, তিনি পুনরায় তাঁহার মাতুলের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল—"তুমি পত্র পাঠমাত্র সুমতিকে এখানে লইয়া আসিবে। একটী পাত্র স্থির করিয়াছি; পাত্রটী বেশ শিক্ষিত; অর্থাদিও বেশী কিছু দিতে হইবে না। আমাদের এই দেশেই বাড়ী; আমার এখান হইতেই বিবাহ হইবে। টাকা কড়ি যোগাড় না হইলেও আসিতে অন্যথা করিও না।" পত্র পাঠ করিয়া অবিলম্বে নরেশচন্দ্র ও কমলা ভগ্নীকে লইয়া মাতুলালয়ে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া সুমতির বিবাহকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। দরিদ্রের বিবাহ—কিছু ধুমধাম হইল না। পাত্রটী খুব ভাল। বয়স

ত্রিশের বেশী নহে। তিনি মেদিনীপুর জেলায় ডাক্তারি করেন। সুমতির বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, জামাতা বিবাহান্তে কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করিয়া সস্ত্রীক কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। নরেশচন্দ্র তাহাতে বেশী কিছু আপত্তি করিলেন না। তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া নরেশচন্দ্র কমলার সহিত স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এতদিনের পর তিনি একটী ভয়ানক দায় ও ভীষণ দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

এতদিন ধরিয়া ভগ্নীকে হাতে করিয়া মানুষ করিবার পর, সুমতি পরের গৃহে গমন করিল। বহুদিনের একত্রে থাকার একটা সদ্ভাব, একটা আন্তরিক মায়া-মমতার বন্ধন বাস্তবিক কয়েক দিন পতি-পত্নীকে কিছু কষ্ট দিয়াছিল। সকল কার্য্যেই যেন তাঁহারা একটু একটু বাধা পাইতে লাগিলেন, বিশেষতঃ কমলার যেন সংসার পরিচালনে অনেক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সুমতি তাঁহার সকল কার্য্যে সহায়তা করিত; এক দিনও বৌদিদির সহিত তাহার মনোমালিন্য হয় নাই। বৌদিদিও তাহাকে আপন কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় ভাবিয়া এতদিন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আজ সেই সকল মায়ামমতা বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে দেশান্তরে পাঠাইতে হইল, ইহাতে কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? কিন্তু করিবেন কি—স্ত্রীলোকের দশাইত এই? জন্মাইলেই তাহাকে পরগৃহবাসিনী হইতে হইবে ভাবিয়া আপনাপনি আশ্বস্ত হইলেন।

এই সময়ে একদিন গ্রামের জমীদার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় দিগের বাটীতে একটী সমারোহ কার্য্য আরম্ভ হইল। পাড়ায়

স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল। নরেশও সপত্নীক তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে অসংখ্য পাড়ার ব্রাহ্মণগুলীর সহিত নরেশচন্দ্রও গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে পাড়ার রামধন শিরোমণিও তথায় ভোজন করিতে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সকলে বসিয়াছেন, নরেশও তাঁহাদের সহিত বসিয়াছেন, এমন সময় সহসা একটা গোল উঠিল—সকলেই সে দিকে চাহিল। রামধন শিরোমণি পংক্তি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন—"যে উড়ের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে, তাহার জাতি নাই, আমি অজাতির সঙ্গে আহার করিয়া আত্মাকে পতিত করিতে পারিব না, আমি খাইব না।" এই লইয়া একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। দুই চারিজন নব্য যুবক বলিল—"এত দিন খাইয়া আসিতেছেন, আর আজ হঠাৎ কি হইল? যখন খাওয়া হইয়াছে, তখন আর কেন?" কিন্তু শিরোমণি সে কথা শুনিলেন না। তিনি যখন শুনিলেন না, তখন কাহার সাধ্য আর নরেশকে সেখানে বসাইয়া খাওয়ায়, তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে আদেশ করা হইল। মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইয়া নরেশ উঠিয়া গেল। কমলাও সে বাড়ীতে গিয়াছিল,—সে, আর পাঁচ মেয়ের সঙ্গে সৌধ গবাক্ষে বসিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন দেখিবার জন্য গিয়াছিল, কিন্তু স্বামীর এই অপমানে সেও কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া আসিল! এবং নরেশের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"তুমি আমায় ত্যাগ কর, আমার জন্য তোমার এত অপমান।"

নরেশের চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বলিলেন—"কমলা আমি আমার জীবন ত্যাগ করিতে পারি, তবু তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। ইহাতে আর হইয়াছে কি, আমরা না হয় এক ঘরে হইব।"

তারপর বলিলেন—"কমলা আর আমরা এ গ্রামে থাকিব না।" এবং তিন চারি দিনের মধ্যে বিষয় আশায় যা কিছু ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়া আবাল্যের স্নেহ মায়াবর্দ্ধিত গ্রাম ছাড়িয়া তাঁহারা কলিকাতায় আসিতে মনস্থ করিলেন।

কমলা সেই দিন হইতে যে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, আর তাঁহার সদা-প্রফুল্ল অধরে হাঁসি দেখিতে পাওয়া যাইত না। রেলে উঠিয়াও সে ঐরূপ বিমর্ষ হইয়াছিল, তারপর মানকর ষ্টেসনের নিকট আসিয়া সে স্বামীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—"আবার বিবাহ করিয়া সুখী হইও। আমার জন্য তোমার সব বিপদ, আমি চলিলাম।" আর মুহূর্ত্ত সময় গেল না, কমলা সেই চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। নরেশও সঙ্গে সঙ্গে লাফাইতেছিলেন, কিন্তু অপর এক যাত্রী তাঁহাকে পড়িতে দেন নাই। তারপর নরেশ কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন তাঁহার জনৈক বন্ধুর বাটীতে ছিলেন; কিছুদিন পরে আর তাঁহাকে তথায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পতিবিয়োগ হইলেই বিধবা পত্নী স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টাদিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বহুকষ্টে জীবন যাপন করেন কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত; নরেশচন্দ্রই পরম পতিব্রতা পত্নী পবিত্র প্রতিমা হৃদয় মন্দিরে যত্নে স্থাপন করতঃ তীর্থ ভ্রমণে বহি-

গত হইলেন। জীবনের অবশিষ্টাংশ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী হইয়া কাটাইবেন—ইহাই স্থির করিয়া আর বিবাহ করিলেন না। রামধনের ন্যায় কয়জন আত্মাভিমানী লোক সংসারে সং সাজিতে ভালবাসে? পাঠক! বল দেখি নরেশচন্দ্রের এই সুখের কুলবন দলন করিবার, তাঁহার মনে চির ঔদাস্যভাব বদ্ধমূল করিবার কর্ত্তা কে? আমরা বলি—রামধনের ভীষণ প্রতিহিংসা।